অতলান্তিক

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ঃ

মহালয়া, ১৩৬৮

প্রকাশনা ঃ

চন্দন মুখোপাধ্যায়

২৩, আকনা চৌধুরীপাড়া লেন

পোঃ শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, ৭১২ ২০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

গৌতম মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ ঃ

শ্রীপ্রদ্যুৎ কুমার গুহ

শ্রীসরযূ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৬১৮/এ, জি. টি. রোড (বটতলা

শ্রীরামপুর, হুগলী।

মুখ্য বিক্রয়-কেন্দ্র ঃ

দত্ত বুক স্টল

৮/১বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

বাবা, স্বর্গ থেকে তুমি আমার—
এই নৈবেদ্যটুকু গ্রহণ করো।

— চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

গল্পকারের নিবেদন

ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতাম। 'লিখতাম' বললে ঠিক বলা হয় না—না লিখে পারতাম না। ফাঁকে ফাঁকে কিছু গল্পও। তার কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, কিছু যায় না। সেসব লেখার অনেকগুলিই খোয়া গেছে। ছোট-খাট পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু ছাপাও হয়েছিল।

সুহৃদ্‌জনের পরামর্শে—একটি কবিতার বই ছাপবার মতলব আসে মাথায়। বাছাই-এর কাজ খুবই কঠিন হ'য়ে পড়ে, তাই তা আজও সম্ভব হয়নি। যে গল্প ক'টি হাতের কাছে পাওয়া গেল, এবং যেগুলি প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি, বা যেগুলির আবেদন হয়তো চিরন্তন—সেগুলি জড়ো ক'রে এই ছোট-গল্পের বই। অনেকগুলি গল্পই এর — দশ, পনের বা বিশ বছর আগের লেখা।

যাঁদের তাগিদে এই প্রচেষ্টা, এবং বিশেষ ক'রে যিনি শেষ মুহূর্তে একটু 'ছোঁওয়া' না দিয়ে দিলে—গল্পগুলো 'কোরা'-ই থেকে যেত—তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়া চলে না, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো নয়ই। নাম-উল্লেখেও অশান্তির ভয়।

বন্ধুবর সুসাহিত্যিক ডঃ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—শুধু সাহসই যোগান নি—বইটির 'ভূমিকা' লেখার দায়িত্ব নিয়েও উৎসাহিত করেছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ দিয়ে 'ছোট' করা চলে না। তাই, শুধু—আগাম ধন্যবাদ দিয়ে রেখে আমার নিবেদন শেষ করছি—তাঁদেরকে—যাঁরা এই লেখাগুলির রসাস্বাদনে প্রয়াসী হবেন।

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

উপনিষদে আছে, স্বীয় মাধুর্য-রস আস্বাদনের ইচ্ছায় ব্রহ্ম তাঁর দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার খণ্ডাংশে মেলে সেই সৃষ্টি-তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

"যেভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ
দুয়ের মিলন-ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা"....

প্রকৃতপক্ষে সব সৃষ্টির মূলেই এক দুর্নিবার ইচ্ছার লীলা। জগৎ-স্রষ্টার মত সাহিত্য-স্রষ্টাও তাঁর ইচ্ছার কুসুম ফুটিয়ে তোলেন সাহিত্যের আঙিনায়। সৃজনকর্তার ইচ্ছার বৈচিত্র্যে সৃষ্টি হয় আনন্দ-বেদনা-ঘন জীবনের জলছবি। কাব্য-পসরায় সৃষ্টির 'সোনার-তরী' পূর্ণ হলেও ইচ্ছার নিবৃত্তি নেই। কবি বলেন,

"ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।"

সৃষ্টির এই ইচ্ছা যে অপ্রতিরোধ্য সে কথাই আবার শোনা গেল বর্তমান গল্পগ্রন্থের রচয়িতা চণ্ডী মুখোপাধ্যায়ের 'গল্পকারের নিবেদন'-এ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের এবং সমসাময়িক ও উত্তরসূরী কয়েকজনের লেখা গল্প বিশ্বের সেরা গল্পের অন্যতম। বিশ শতকের বাংলা গল্পের বিস্ফার ও বৈচিত্র্য রীতিমত বিস্ময়কর। শুধু 'ছোটো ছোটো দুঃখ-কথা' বা 'সহস্র বিস্মৃতিরাশির' 'দু-চারিটি অশ্রুজল' নয়, এ-যুগের গল্পের উপাদান রহস্যময় মানব-মনের বিচিত্র সূক্ষ্ম ভাব-লীলা। ব্যক্তি-মনের বিচিত্র বাসনা-কামনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মোহ-আবেশের ফল্গুধারাকে সর্বজনীন ও রসবেদ্য করে তোলাতেই আধুনিক লেখকের অভিনিবেশ।

'অতলান্তিক' শ্রী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পসঙ্কলন। এই প্রথম প্রয়াসেই তিনি এই আঠারো উপচারে যে নৈবেদ্যটি সাজিয়ে পাঠক সমাজকে উপহার দিলেন তার বিষয়বস্তু, গঠন-শৈলী, উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য পাঠকমনকে নাড়া দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মানব মনের নিগূঢ় রহস্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে দৃষ্টি রহস্যসন্ধানী—কোথাও সস্মিত, কোথাও বা তীর্যক, কিন্তু রুক্ষ নয় কদাপি। নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, অথবা সভ্যতাভিমানী মানুষের হাস্যকর আচার-আচরণ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর গল্পের কাহিনী। গল্পের আবহ ও সংহত ভাবরস সৃষ্টিতে তিনি সতত সমনস্ক।

স্বাদে ও বৈচিত্রে প্রতিটি গল্পই এক একটি নিখুঁত সৃষ্টি। প্রকাশ-মাধুর্য, সরসতা, চমক, এবং নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক অনুরণন, নির্দোষ রঙ্গ-রস — সব মিলিয়ে গ্রন্থটিকে একটি যথার্থ রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

সাহিত্য-জগতে নবাগত হলেও, গল্পগুলির উপাদান, উপস্থাপনার অভিনবত্ব ও রস-সৃষ্টি নিঃসন্দেহে বঙ্গ-সাহিত্যের ছোট-গল্পের আসরে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

গ্রন্থে সঙ্কলিত এতগুলি ভিন্ন স্বাদের গল্প মনকে স্বতঃই আনন্দে ভরিয়ে তোলে। বলা বাহুল্য, কোন গল্পের পর্যালোচনা ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। সে দায়িত্ব গল্প-পিপাসু পাঠকের। আমি শুধু লেখকের এই প্রয়াসের দিকে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আর লেখককে জানাচ্ছি অকুণ্ঠ সাধুবাদ।

সূচীপত্র

—***—

অতলান্তিক

প্রসাধন সম্পূর্ণ ক'রে—দু'পা পিছিয়ে আসে মল্লিকা। খুঁটিয়ে একবার দেখে নেয় নিজের সারা অবয়ব সামনের আয়নাটার মধ্যে, তারপর আবার এগিয়ে গিয়ে—শেষ কাজটুকু সারে—কুমকুমের টিপটি এঁকে নেয় জোড়াভ্রূর ঠিক উপরটিতে। ঠিক এমনি সময়—ঘড়িতে ঢং ক'রে সাড়ে পাঁচটার ঘণ্টাটা বাজে, আর বেজে ওঠে দরজার কলিং বেলটা। অবাক চোখে তাকায় মল্লিকা—দরজার দিকে- -এ সময় তো কারো আসবার কথা নয়। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে পিপ্-হোলের মধ্যে দিয়ে বাইরেটা দেখে, দেখেই অবাক হয় —একটু যেন চমকেও যায়। অসীম! এ সময় তো ও কোনদিনই ফেরেনা। ব্যাপার কি? শরীর খারাপ-টারাপ নয়তো? মল্লিকা যেন একটু বিরক্তই হয়। দরজাটা খুলে দেয়।

ঘরে ঢুকেই অসীম অবাক। মল্লিকাকে এমন ক'রে সাজতে তো সে কোন দিনই দেখেনি, তাই প্রশংসা না ক'রে পারে না। "কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে"—সংক্ষেপে প্রশস্তি জানায়। সে কথায় কান না দিয়ে মল্লিকা ব'লে ওঠে—"এত সকাল সকাল?" "আজ হঠাৎ ছুটি হ'য়ে গেল সকাল সকাল, এত তাড়াতাড়ি সোজা ক্লাবে না গিয়ে ভাবলাম—একবার বাড়ী হয়েই ক্লাবে যাব। তাই।" হালকা সুরে যোগ করে—"কোথাও বেরুচ্ছিলে নাকি?" "আমি আবার কবে কোথায় বেরুই? আমার তো আর ক্লাব টুাব নেই—আর বন্ধু বান্ধবও নেই।" মল্লিকার সুরে ঝাঁজ। "না, সাজ-গোজ দেখে ভাবলাম……" আর বলতে হ'ল না, "তাহলে আমার সাজগোজ চোখে পড়ে তোমার!" হুল ফোটায় মল্লিকা। "ভোলা কোথায় গেল? এক কাপ চা হ'লে মন্দ হ'ত না"—সহজ সুরে বলে অসীম। "এ সময় তো সে কোন দিনই বাড়ী থাকে না, তার বেড়াবার ছুটি। আমিই ক'রে দিচ্ছি।" বলেই পাশের কিচেনে

ঢোকে মল্লিকা। পাঁচ মিনিটও লাগে না, এক কাপ চা আর এক টুকরো কেক নিয়ে এসে সামনে বাড়িয়ে ধরে। অসীম ভাবে, যাদু জানে নাকি মল্লিকা, এত তাড়াতাড়ি চা। ওর ব্যস্ততা দেখে একটু যেন হাসে মনে মনে। কেকটা মুখে পুরে দিয়ে চায়ে চুমুক দেয় অসীম, মল্লিকা সামনে দাঁড়িয়ে থাকে—কেমন যেন অস্থির ভাব তার। একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে চা'টা নিঃশেষ করে অসীম। কাপটা নামিয়ে রেখে সোজা উঠে গিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়। মল্লিকা কোন কথা বলে না, কোন প্রশ্ন করে না। তবু, অসীম—"ক্লাবে চললাম, ন'টার মধ্যেই ফিরবো"—ব'লে বেরিয়ে যায়। মল্লিকা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা লক্ করে, তারপব—আর একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে ধীর পায়ে সামনের ব্যাল্‌কনীতে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, যা দেখবার জন্যে ওর দৃষ্টিটা পার্কের অপর প্রান্তেব বেঞ্চের উপর আছড়ে পড়ে, তা ওর চোখে পড়ে না। নিচের দিকে চোখ নামিয়ে দেখতে পায়—অসীম ট্রাউজারের পকেটে বাঁ হাতটা ভ'বে রেখে ক্যাব্‌লার মত হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হল। গা'টা ওর 'রী' 'রী' ক'রে ওঠে।

ব্যাল্‌কনী-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় ওর নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে ব'সে পড়ে মল্লিকা। গত সাত দিনের মধ্যে একদিনও তো সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়নি—তার ওপারের ঐ বেঞ্চটিতে এসে বসতে। সেই সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, চোখে চশমা, হাতে বই—তার কন্দর্পের। ঐ সাতদিন আগেই প্রথম যেদিন সে বুঝতে পারে তার ওখানে বই নিয়ে বসা—বই পড়ার জন্যে নয়, ওর ব্যাল্‌কনীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্যে—সেদিন থেকেই ও সারা দেহ-মনে কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করেছে, এবং ঠিক তার পরদিন থেকে নিজেও ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সাজ-গোজ সেরে ব্যাল্‌কনীতে দাঁড়াতে সুরু করেছে। পরশু ইচ্ছে ক'রেই মল্লিকা দেরি করেছিল—পাশের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেছিল—

তার সে ব্যাকুল চাউনি, সে অস্থিরতা। আজ কি সে তারই শোধ নিচ্ছে—মল্লিকা ভাবতে থাকে। ও নিজেও শোধ নিতে জানে, শোধ নেবে—মল্লিকা অভিমান করে। আবার ভাবে, ওরও তো অন্ততঃ দশ মিনিট দেরি হয়েছে আজ বারান্দায় আসতে—অসীমের বে-আক্কেলে 'এসে পড়ার' জন্যে। অপেক্ষা ক'রে ক'রে সে ফিরে গেল নাকি ? আতঙ্কিত হয় মল্লিকা। এই ক'দিন ওকে যেন 'নিশি'তে পেয়ে আছে। সারাদিন ছট্‌ফট্ করে—কখন এই "সাড়ে পাঁচটা'-টা বাজবে, কখন ও বারান্দায় আসবে, কখন দেখা পাবে পার্কের ওপারের বেঞ্চে ব'সে থাকা কন্দর্পকে তারই প্রতীক্ষায়।

আজ মল্লিকাকে আশাহত হ'তে হ'ল। যত রাগ হচ্ছে তার অসীমের ওপর, তত অভিমান হচ্ছে কন্দর্পের উপর—ঐ নামই তাকে দিয়েছে মল্লিকা মনে মনে। শোধ সেও তুলতে জানে—কাল দেখিয়ে দেবে সে বাছাধনকে। সাড়ে পাঁচটায় একবার বারান্দায় এসে দেখা দিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকে যাবে—আর বাইরে আসবেই না। তারপর, পাশের ঘরের জানালার খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে থাকবে তার অবস্থাটা, তার ছট্‌ফটানি। এ ক'দিনে অন্ততঃ মল্লিকার বুঝতে বাকী নেই যে, তার জন্যেই কন্দর্পের রোজই ঠিক ঐ সময় এসে ঐ বেঞ্চে ব'সে তার বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকাব কারণটা। মল্লিকা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই যে সে খুশিতে ঝলমল ক'রে ওঠে, আর ভেতরে চলে গেলে কেমন মুষড়ে পড়ে—তা তো ও এতদূর থেকেও বুঝতে পারে। অথচ কত ভদ্র, একবার একটু ইশারা ইঙ্গিত করার চেষ্টাও করেনি সে এ ক'দিনের মধ্যে একটি বারের জন্যেও।

ছ'টা বাজে। এবার উঠবে উঠবে ভাবছে মল্লিকা হতাশ হয়েই। এমন সময় ও কী ? ঐ তো আসছে তার কন্দর্প ধীর পায়ে। ধীরে ধীরে, ও দিককার ছোট গেটটা ঘুরে ঘুরে পার হয়ে ঢুকছে পার্কে। ওখান থেকেই চোখ রেখেছে ওর বারান্দার দিকে। ঐ তো গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, হাতে বই। ওর বারান্দার দিকে

চোখ রেখেই এসে বসছে বেঞ্চে ওর নির্দিষ্ট স্থানটিতে। উঃ এত দেরি! ও তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ভাবছিল কোন বিপদ-আপদ হ'ল না তো! ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় যে রোজ এসে বসে—প্রায় সাতটা পর্যন্ত, তার আজ হ'লটা কি? এই ভাবে রোজই সন্ধ্যা হয়ে এলে—মল্লিকাকেই স'রে যেতে হয় বারান্দা থেকে. ভোলা পৌনে সাতটা নাগাদ ফিরে এলেই। তখন ঘরের সব আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে বারান্দার সামনে ঘরের অংশটুকুর মধ্যে নানা কাজের অছিলায় ঘোরাফিরি করা ছাড়া উপায় থাকেনা মল্লিকার। ভোলা কিছু আন্দাজ করে না তো? তারপর সাতটার সময় তার কন্দর্প ধীর পায়ে উঠে গিয়ে পার্কের ছোট গেটটার কাছ থেকে ঘাড ফিরিয়ে শেষ বারের মত তার বারান্দার দিকে তাকিয়ে নিয়ে তবে অদৃশ্য হয়।

এ সময়টা ও যা চিন্তা করে রোজই, আজও তাই সুরু করে মল্লিকা। অর্থাৎ তার কন্দর্পের সম্ভাব্য পরিচয় ইত্যাদির কথা। চেহারার আদলটা তার চেনা চেনা মনে হলেও—কিছুতেই ঠিক করতে পারেনা—কবে কোথায় দেখেছে তাকে। কি করে সে? কবি? সাহিত্যিক? নাকি স্কুল মাস্টার? ধেৎ। তা যদি হযও তাহলে নিশ্চয়ই কলেজের লেকচারার। তার চেয়ে ইউনিভার্সিটির কোন প্রফেসরও তো হ'তে পারেন। আন্দাজের পর আন্দাজ ক'রে চলে মল্লিকা। ঐটিই তার রোজ এই দেড় ঘণ্টা সময়ের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বা কেন? সারাদিনই তো ভাবে সে এইসব কথা। এমনকি রাতে অসীমের পাশে শুয়েও তো ঐ একই চিন্তা তার। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী, পায়ে চপ্পল, চোখে চশমা, হাতেবই, বুক টান ক'রে হাঁটার ধরন, সব মিলিয়ে এত ভাল লাগে ওকে—ভাবতেই পারে না আর মল্লিকা। হঠাৎ ওর মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায়—ছোটবেলায় ও যখন ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ী আসত—তখন ওর বাবাকে যেন ঠিক ঐ রকমই দেখাত। ঐ রকম পোষাক, ঋজু চেহারা, ঐ রকম ব্যক্তিত্ব।

হেড্ অফিস থেকে প্রমোশন নিয়ে কলকাতা অফিসে বদলি হয়ে এসেই প্রথামত আলাপ ক'রে নেন মিঃ মোটা সব সহকারীদের সঙ্গেই। 'মিট্রা'কে ওঁর ভাল লেগে যায়। তা কি নামের, পদবীর, সাদৃশ্যের জন্যেই শুধু? 'মিট্রা'কে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠান, বিশেষ ক'রে আলাপ করেন। পরের দিন তাকে বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন তাঁর বাংলোয়। মিত্র একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে, তবু যেতে রাজী হ'তেই হয়। হাজার হোক উপরওয়ালা, তায় বেশ সজ্জন বলেই মনে হয় তাঁকে। পরের দিন বিকেলে মিঃ মোটার গাড়ীতে যেতে যেতে আন্দাজ পায় কোন দিকে চলেছে সে, কোন কথা বলে না। মেমসাহেব একেবারেই 'আট-পৌরে' ধরনের। সাহেবীয়ানা দূরের কথা —বড়লোকী ভাবই নেই। ইতিমধ্যে ঘরদোর সাজিয়ে নিয়েছেন। বুককেসে থরে থরে সাজানো বই—দেখেই মনে হয় পড়াশুনার বাতিক আছে সাহেবের। চা-পর্ব শেষ হবার পর সাহেব পোষাক বদলে ওকে নিয়ে সামনের পার্কে গিয়ে বসেন, স্ত্রীকেও অনুরোধ জানান সঙ্গে আসতে। তিনি বলেন—"তোমার 'মিট্রা'কে না খাইয়ে ছাড়া যাবে না, তাই আমাকে আজ ছুটি দিতে হবে।" দু'জনেই হাসতে থাকেন। অগত্যা মিত্রকে বস-এর সঙ্গে কাটাতে হয় বেশ কিছুক্ষণ সময় পার্কে ব'সে এবং তাঁর অতীত জীবনের গল্প শুনতে শুনতে। বাঙালী ছেলে-মেয়েদের, বাঙালী পরিবারের পরিবেশ যে তাঁর খুব ভাল লাগে, তিনি যে স্বেচ্ছায়ই কলকাতায় বদলি নিয়েছেন, তাও প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি উপন্যাসের গুজরাটী অনুবাদ তাঁর প্রায় মুখস্থ। বিবেকানন্দের ইংরাজী লেখা, ইংরাজী অনুবাদ তাঁর খুবই প্রিয়। কিছুদিন আগে নতুন একসেট্ কিনে এনেছেন—যদিও অধিকাংশই তাঁর আগেই পড়া হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় বলেই ফেলেন, তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতনে-পড়া মেয়ে এবং "বাংলা" তাঁদের পরিবারে ভাল ভাবেই অনুপ্রবেশ করে গেছে। পার্কে ব'সে সাহেবের কথা শুনতে শুনতে 'মিত্র'র মাথায় এক অদ্ভুত চিন্তা খেলে যায়। এক অদ্ভুত পরিকল্পনা।

কি-ভাবে সে পরিকল্পনাকে রূপদান করা যাবে—সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে সে। মিঃ ম্যেটা তার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে জানতে চান, তার হ'ল কী ? সুযোগ পেয়ে মিত্র সবিনয়ে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলে। "কিছু যদি মনে না করেন" বলেই থামতে হয় তাকে। সাহেবের হাস্যময় মুখের দিকে চোখ পড়তেই সাহস ক'রে বাকিটা ব'লে ফেলে। "বিবেকানন্দ আমার বাংলায় মোটামুটি পড়া আছে। তাঁর ইংরাজী লেখা, আর তাঁর লেখার ইংরাজী অনুবাদ পড়ার সুযোগ হয়নি। আপনার যদি অসুবিধা না থাকে ......" আর বলতে হ'ল না—ম্যেটা সাহেব তার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলে ওঠেন, "স্যুয়োর স্যুয়োর।" তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে মিত্র—"মানে, আমি চাইছি আপনার এখানে রোজ ছুটির পর এসে প'ড়ে যাব, বাড়ীতে আমার ঠিক সে পরিবেশ নেই।" "তাতে আর অসুবিধা কি ?"—সোৎসাহে বলেন ম্যেটা সাহেব। "তবে, রোজ তো আমি তোমার সঙ্গে ফিরতে পারবো না, তোমার তো সাড়ে চারটেয় ছুটি। যে দিন আমাব দেরি হবে তুমি সোজা চলে আসবে, তোমার ভাবাজির সঙ্গে তো আলাপ হ'ল, দেখবে তিনি এ ব্যাপারে আমার থেকেও বেশী উৎসাহী। তোমার কোনই অসুবিধে হবে না।" মিত্র যেন হাতে-চাঁদ পেয়ে যায়—এমনি ভাব দেখিয়ে ব'লে ওঠে—"তা হ'লে কাল থেকেই, মানে কাল তো রবিবার—সোমবার থেকেই শুরু করি ?" "নিশ্চয়ই, এসব ব্যাপারে দেরি ক'রতে আছে ?" এমনি সময় মিসেস্ ম্যেটা গুটি গুটি এসে দাঁড়ান পেছন দিক থেকে। বলে ওঠেন—"আমার কিচেনের কাজ শেষ, তোমাদের গল্প শেষ হ'লেই ব'সে পড়তে পার।" বলেই মিত্রর পাশেই বসে পড়েন পার্কের বেঞ্চে। মিঃ ম্যেটা মিত্রর প্রস্তাবটা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। শুনে তিনি প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। বলে ওঠেন, "চমৎকার হয়, ঐ সময়টা আমি বড় একা একা বোধ করি, বড্ডই 'ব্যোর' লাগে,—মিষ্টার তো অধিকাংশ দিনই ফিরতে দেরি করেন......" তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ ম্যেটা বলে ওঠেন—"ও, নো নো, তুমি ওকে ডিস্টার্ব ক'রতে পারবে না। ওকে

নিরিবিলিতে পড়তে দিতে হবে। আর বাড়ীতে নিরিবিলি পড়বার সুবিধে নেই বলেই না ও এখানে এসে পড়বার কথা ভাবছে"। "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে—আমি কোন ভাবেই ডিস্টার্ব ক'রতে যাব না, স্রেফ্ এক কাপ চা ক'রে তো খাওয়াতে পারবো—তাতে আর কতটুকু বিরক্ত করা হবে ওকে ?"—সকলেই একসঙ্গে হেসে ওঠেন ।

পরের দিন অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ বড়বাবু, নবীন রায় মন্তব্য করেন—"এক-দিনেই বড় সাহেবকে ম্যানেজ ক'রে নিলেন ডঃ মিত্র।" জবাবে ও শুধু একটু হাসে। বুঝে নেয় এ মেয়েটা সাহেবের ড্রাইভারের কীর্তি। ইতিমধ্যেই রিপোর্ট করা হয়ে গেছে ।

দর্শন-শাস্ত্রে এম.এ. পড়ছিল অসীম, বিশেষ আগ্রহ তার মনস্তত্ত্বে। প্রফেসর বোস ওকে যেমন স্নেহ ক'রতেন, ও-ও তেমনি সমীহ করতো তাঁকে, শ্রদ্ধা করতো ওঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতাকে। ওর যাতায়াত ক্রমেই বেড়ে চলছিল ওঁর বাসায়। তারপর ও যখন রিসার্চ শুরু করলো, কাজ শুরু করলো তাঁরই খবরদারীতে। নিজের ছেলের মত স্নেহ ক'রতেন তিনি ওকে। এমনই চলছিল ক'বছর। হঠাৎ পট-পবিবর্তন ঘটলো মল্লিকার আবির্ভাবে। বোস সাহেবের একমাত্র মেয়ে। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করতো সে, পড়া শেষ করে ফিরলো সে-বছর। এর মধ্যে মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় দু'একবার যখন এসেছে অসীমের সামনা-সামনি হয়নি, তেমন যোগাযোগও ঘটেনি। এবারে পড়া শেষ ক'রে এসে সেও ব'সতে আরম্ভ ক'রলো—ওঁদের শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে প্রায়ই, প্রায় রোজই। ওদের মধ্যে আলাপ বেড়ে চললো। প্রফেসরের

প্রশ্রয় ছিলই—আলাপ ক্রমে ঘনতর হ'ল, পরিণামে পরিণয়। ততদিনে অসীম রিসার্চ শেষ ক'রে একটি বড় ফার্মে পাবলিক রিলেশন্ অফিসারের চাকরী নিয়ে—কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে ফ্ল্যাট্ ভাড়া ক'রে বাস করা শুরু করেছে, বিয়ে ক'বে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। দু'টি প্রাণীর সংসার, কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড ভোলা—সবই করে, তাই ওরা দুজনে ঝাড়া-হাত-পা গৃহকর্মের ব্যাপারে। দুটি বছর কেটে গেছে একটি একটি দিনের হিসেব রাখতে রাখতে। বিয়ের আগেই আগ্রহ, কৌতূহল অনেকটাই সম্পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, তাই সংসার ক'রতে ক'রতে নতুনত্বের অভাব অনুভব ক'রতে থাকে ওরা। দিন দিনই যেন কেমন 'ছাড়াছাড়া' ভাব প্রকাশ পেতে থাকে ওদের দাম্পত্য জীবনে। অসীম মনস্তাত্ত্বিক। বিশ্লেষণ ক'রতে থাকে ওদের মানসিক অবস্থা, খুঁজে বার করতে থাকে আসল রোগটা কোথায়। আবার "রিসার্চ" শুরু হয় ওর,—নিজেদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে। তারই মধ্যে কাটতে থাকে ওদের দাম্পত্য জীবন মন্থর গতিতে নতুনত্ব-বিহীন, নিস্তাপ। মাঝখানে ভোলা—প্রশান্ত মহাসাগর আর অতলান্তিকের মাঝে—পানামা ক্যানালের কাজ চালিয়ে যায় সারাদিন। কেবল দিনে দেড়-দুঘণ্টা ছুটি তার চাইই চাই- বিকেলের দিকে। ঐ সময়টি তার একেবারে নিজস্ব। অসীম স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে ঘাটতি ঘটায়নি, মল্লিকাও স্বামীর প্রতি যন্ত্রবৎ। অফিস থেকে ফেরার পথে অসীমের একবার ক'রে ক্লাবে যাওয়ার অভ্যাস ছিলই, ইদানীং ফিরতে রাত প্রায় ন'টা বেজে যাচ্ছে। মোহনবাগান ক্লাবের কি একটা বিভাগের সহ-সম্পাদক সে। তবে শনি আর রবিবারের সন্ধ্যাটা মল্লিকার জন্য বরাদ্দ করা তার ছিলই। ইদানীং মল্লিকার উৎসাহের অভাবে ঐ দুটো দিনও তাকে ক্লাবেই কাটাতে হ'চ্ছে।

আরও সাতটা দিন কেটে গেছে। শনি আর রবিবার ওর কন্দর্পের দেখা পায়নি মল্লিকা। কেন? মোটেই আন্দাজ ক'রতে পারেনি তা সে। 'আউটিং'এ যায় নাকি তার কন্দর্প ঐ দু'টো দিন? কোন সভা-সমিতি বা অন্য কিছু? অন্যান্য দিনগুলোর বিকেলের ঐ দেড়টি ঘণ্টা ওর দেড়-মিনিট ব'লে মনে হয়েছে, আর দিন-রাতের বাকী সময়টা মনে হয়েছে এক একটি যুগ বলে। শনি আর রবিবার দুটো সারাদিন ছট্‌ফট্ করেছে ও। অসীমের অনুরোধ উপেক্ষা করেছে, সিনেমা বা মার্কেটিং-এ যেতে চায়নি। অপেক্ষা ক'রে ক'রে অসীম ক্লাবে চলে গেছে, এবং রোজ যেমন করে, তেমনি রাত ন'টার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছে। মল্লিকা আর স্থির থাক্‌তে পারছে না। ও মনস্থির করেই ফেলেছে, এরপর একদিন সে সোজা চলে যাবে পার্কের ঐ বেঞ্চটিতে ওর কন্দর্পের সঙ্গে পরিচয় ক'রতে। কখন যাবে? সাড়ে পাঁচটার আগেই? নাকি সে এসে বেঞ্চে বসবার পর? এক একবার ভেবেছে, একটু আগে থেকে গিয়ে বসে থাকবে ঐ বেঞ্চটিতে। পরখ ক'রে দেখবে, ভদ্রলোক অপরিচিতার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন। আবার মনে হ'য়েছে, 'অপরিচিতা' এক মহিলাকে ব'সে থাকতে দেখে সে যদি ফিরে যায়, বা অন্য কোথাও গিয়ে বসে, তা হ'লেও তো মুস্কিল। আচ্ছা, তার কন্দর্প কি তার পরিচয় জানে? জানে কি যে সে অসীমের স্ত্রী? জানে কি যে সে একটা বিখ্যাত কোম্পানীর মস্ত বড এক অফিসারের সহধর্মিণী?—ভেবেই পায় না ও উত্তরটা।

সোমবার ঠিক পাঁচটার সময় মিত্র পৌঁছে গেছে ম্যেটা সাহেবের বাংলোয়, বগলে একটা বড় সড় প্যাকেট। মেমসাহেব জানতে চেয়েছেন, "কি আছে ওতে?" —এটুকু বলেই চায়ের ব্যবস্থা ক'রতে চলে গেছেন মিত্রকে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে আসতে বলে। মিত্র মুখ-হাত ধুয়ে, পোষাকটাও পালটে নিয়ে যখন ড্রইং-রুমে

এসে বসেছে, তখন মেমসাহেব অবাক। "এ পোষাক পেলে কোথা? ওঃ ঐ প্যাকেটে তাহলে পোষাকই এনেছিলে।"—অবাক হন তিনি। মিত্র বলে—"ঐ ধড়াচূড়া প'রে যুৎ ক'রে বসে পড়া যায় না। একটু রিল্যাক্সড্ হয়ে বসতে গেলে আমার দেশি পোষাকই বেশি পছন্দ। মেমসাহেবেরও পছন্দ হয়। চা শেষ ক'রে মিত্র যখন পকেট থেকে চওড়া ফ্রেমের চশমাটা বার ক'রে নাকের ওপর বসাতে যাবে, মেমসাহেব বলে ওঠেন, "ও কি? স্পেক্স? তুমি চশমা ব্যবহার কর নাকি?" মিত্রকে বলতে হয়, "নরম্যালি করি না, শুধু পড়বার সময় হ'লে ভাল হয়। রিডিং গ্লাস—প্লাস ওয়ান্ পাওয়ার।"

সেলফ্ থেকে "বিবেকানন্দের" প্রথম ভলিউম্‌টা টেনে নিয়ে মাথাটা একটু নুইয়ে সম্মতি নেওয়ার ভঙ্গিতে মিত্র ধীর পায়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে পার্কের দিকে এগোয়। মিসেস ম্যেটা স-প্রশংস দৃষ্টি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করেন হাসিমুখে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যখন পার্কের আলোতে আর বই পড়া চলে না তখন ফিরে আসে সে ম্যেটা সাহেবের বাংলোয়। বাথরুমে ঢুকে আবার পোষাক পাল্টায়। ছাড়া পোষাকগুলো আবার প্যাকেটে ভ'রে ড্রইং-রুমের একটা খালি দেরাজে ভ'রে রাখে—পরের দিন ব্যবহারের জন্যে। চপ্পল জোড়া রেখে দেয় দেরাজের নিচে। কারণ জানতে চাইলে—মিত্র মেমসাহেবকে বলে—"একটু ক্লাব হ'য়ে বাড়ী ফিরবো, তাই। ওখানে ধুতি-পাঞ্জাবীতে সুবিধে হয় না। ওটা শুধু বাড়ীতেই পরি।"

এই ভাবে চলেছে কয়েকটা দিন। কোন কোন দিন মিঃ-ম্যেটা এসে পৌঁছেছেন। সেদিন ওকে আর-এক রাউণ্ড চা না খেয়ে যেতে দেন নি। তিনি ওর "বাঙালী" পোষাকের তারিফ করেছেন প্রচুর। বলেছেন "তোমাকে ঠিক 'পোয়েট' 'পোয়েট' দেখাচ্ছে মিট্রা, ভেরি লাভলি, ভেরি স্যোবার।"

আজ মনস্থির ক'রে ফেলেছে মল্লিকা। আজ সে যাবেই তার কন্দর্পের সঙ্গে আলাপ ক'রতে। প্রথমে রোজকার মত সাজ-গোজ ক'রে ব্যালকনি থেকে একবার দেখা দেবে, তারপর সোজা চলে যাবে পার্কের ওপারে ঐ বেঞ্চের কাছে, সোজা কোনদিকে না তাকিয়ে। একেবারে চমকে দেবে তাকে। ও মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করে—ওকে কাছে পেলে কন্দর্পের প্রতিক্রিয়াটা কেমন হবে। সে কি খুব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে? নাকি নার্ভাস ফিল ক'রবে? কি ভাবে কী কথা বলবে ও তারও একটু মুসাবিদা ক'রে নেয় মনে মনে। হঠাৎ মনে হয়, অসীম কী ভাববে? তৎক্ষণাৎ মনটাকে শক্ত ক'রে নেয় মল্লিকা। ও তো অন্যায় কিছু করছে না। কেন, ওর কি কোন বন্ধু থাকতে নেই নাকি? কোন পুরুষ-বন্ধু? অসীমের যদি কোন মেয়ে বন্ধু থাকে তাতে কি ওর খারাপ লাগবে? অবিশ্যি তা যে নেই অসীমের, তা ও ভাল ক'রেই জানে। যা লাজুক প্রকৃতির লোক সে, প্রথম আলাপের দিনগুলোতে তো মুখ তুলে তাকাতেই পারতো না সে ওর দিকে।

পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ভোলা বাইরে চলে যেতে না যেতেই মল্লিকা বাথরুম থেকে গা ধুয়ে বার হয়, তাড়াতাড়ি সাজ-গোজ শুরু করে। আজ কিছুতেই যেন ওর মনঃপূত হয় না নিজের সাজ বা পোষাক। তিনবার শাড়ী পাল্টানো হয়ে গেল। শেষে ভাবলো সাদা পোষাক প'রবে আজ। সাদা সিফনের শাড়া, সাদা সাটিনের ব্লাউজ। আর অলঙ্কার? মুহূর্তেই মন স্থির করে ফেলে মল্লিকা। গত বছর বিয়ের তারিখে—অসীমের দেওয়া মুক্তোর সেট্—হার, কানের দুল, হাতের কঙ্কণ—সব বার ক'রে প'রে নেয়। হঠাৎই ওর খেয়াল হয়, আজই তো ওদের বিয়ের তারিখ। একেবারেই মনে পড়েনি—ঐ ক'দিনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় অসীমের কি মনে আছে আজকের তারিখটা? গত বছরেও তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়নি। সকাল সকাল ফিরে ছিল—মুক্তোর সেট উপহার হাতে নিয়ে। এ বছরে নিশ্চয়ই মনে নেই অসীমের।

মনে মনে দোষারোপ করতে থাকে ও অসীমের উপর। তবু যেন একটু আশ্বস্ত হয়—মনে নেই বলেই তার সকাল সকাল বাড়ী ফেরার কথা মনেই পড়বে না। দূর ছাই, কী সব যা-তা ভাবছে ও। তাড়াতাড়ি তৈরী হ'তেও ওর সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। ব্যালকনিতে গিয়েই দেখে তার কন্দর্প হাজির। আজ ওর সাদা পোষাক দেখে মনে হয়, বেশি খুসি হবে সে। ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সে- তার কন্দর্পের দিকে। এতদূর থেকেও ওর মনে হয় যেন তারিফ করছে সে ওর সাজ-গোজের। চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে তার চোখ দেখা না গেলেও—ও ঠিক অনুভব ক'রতে পারে তার কন্দর্পের সংযত উচ্ছ্বাস।

বাইরের দরজায় লক্ ক'রে, চাবিটা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে, নিচে নেমে আসে মল্লিকা। সামনের পার্কে ঢুকে সোজা হাঁটতে থাকে ওপারে ব'সে থাকা তার কন্দর্পের দিকে। ওর মনে হয়, সে যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, যেন ওকে প্রত্যাশা করছিল এতক্ষণ। যেন ও পৌছলেই ওকে স্বাগত জানাবে। কোন দিকে না তাকিয়ে ও হেঁটে চলে সোজা ওপারের বেঞ্চটার দিকে। হ্যাঁ, ঐতো সে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে—প্রতিটি মূহূর্ত যেন আশা ক'রছে ওর আগমনের, ওর তার কাছে পৌছে যাওয়ার।

মাত্র হাত দশেক দূর আর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মল্লিকা স্থাণুর মত। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের বেঞ্চে বই হাতে ব'সে থাকা ভদ্রলোকটির দিকে—যার মুখে স্মিত হাসি, স্বাগত ভঙ্গি। কয়েক মুহূর্ত্তেই সামলে নেয় মল্লিকা নিজেকে। কয়েক মুহূর্তের বিহ্বল ভাব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়, আবার হাঁটতে থাকে বাকি কয়েকটা পা। সোজা এসে বসে পড়ে বেঞ্চের উপর—ঠিক সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, চোখে চশমা, হাতে বই ভদ্রলোকটির গা ঘেঁষে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে—কারো মুখেই কথা নেই। দু'জনে পাশাপাশি, তবু—মুখোমুখি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—কয়েক মুহূর্ত, কয়েক মিনিট। মুখে কোন কথা

বলে না কেউই। প্রকাশ্য পার্কে না হলে যেন দু'জনে দু'জনকে জড়িয়েই ধরতো—এমনি ভাব দু'জনেরই—এমনি মনের অবস্থাও।

পায়ের মৃদু শব্দে পিছনে তাকায় মিত্র। দেখে মিসেস্ মেহ্টা পিছনে এসে দাঁড়িয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলে যাচ্ছেন, বোধ হয় ওর পাশে একটি মেয়েকে প্রায় গায়ে-গায়ে ব'সে থাকতে দেখেই। মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানায় তাঁকে। উঠে গিয়ে প্রায় ধ'রেই আনে তাঁকে মল্লিকার কাছে। বলে —"আলাপ করিয়ে দিই—ইনি মিসেস্ মেহ্টা —আমাদের ডিরেক্টরের স্ত্রী —আমার নতুন ভাবীজী।" আর মল্লিকার দিকে দেখিয়ে বলে—"ইনি আমার স্ত্রী। ক'দিনের জন্যে এলাহাবাদে বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন, আজ সকালে ফিরেছেন। আমি এখানকার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম—আজ অফিসে বার হবার সময়—তাই চলে এসেছেন।" মিসেস্ মেহ্টা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন। "এঁর কথা তো তুমি আগে বলনি। আমাকেও সারপ্রাইজ দিতে চাও নাকি? তা, ভালই হ'ল—উনিও আজ তাড়াতাড়ি ফিরছেন। সকলে একসঙ্গে 'ডিনার' করা যাবে।" বলেই পালাতে চাইলেন—বোধ হয় ওদের একটু 'একা' থাকতে দিতে চাইলেন ব'লেই। মল্লিকাও সপ্রতিভ, ও বলে ওঠে—"আজ নয় ভাবীজী, আজ আমাদের একটু প্রোগ্রাম আছে, আজ মাপ করুন, অন্য একদিন......" ওকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই বলে মিত্র—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে—"তার আগে একদিন আপনাদের—আমাদের ফ্ল্যাটে পায়ের ধূলো দিতে হবে।" মিসেস্ মেহ্টা বোধহয় বুঝে নিলেন অনেকদিন পর স্বামী স্ত্রীর দেখা, তাই আর আট্‌কাতে চাইলেন না। একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে পা বাড়ালেন নিজের বাংলোর দিকে।

মল্লিকা টান দেয় অসীমের হাত ধরে—"চল, চল, আর বুড়োদের মত পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে হবে না।" দুজনে উঠে প'ড়ে, পার্কটার পুরোটা একপাক ঘুরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বাইরে বেরিয়ে আসে ওরা। মল্লিকা আহ্লাদের সুরে বলে—"চলো একটু

মার্কেটের দিকে—গড়িয়াহাট মার্কেটে।" পথেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায় ওরা। মল্লিকা অসীমের গায়ে হেলান দিয়ে বসে। অসীমের একটু অস্বস্তিই লাগে—পাগড়ীর পেছনে চোখ থাকেনা ঠিকই, সামনের আয়নাটা তো ওদের ছবিটা তুলে ধরতে কার্পণ্য করবে না—ড্রাইভারের চোখের সামনে।

গড়িয়াহাটে পৌঁছে মল্লিকা কিছু মিষ্টির অর্ডার দিয়ে অসীমকে বলে—"তুমি ওগুলো ডেলিভারি নিয়ে দু'মিনিট অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি।" দশ মিনিটের মধ্যে মল্লিকা ফিরে আসে মস্ত একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে। গন্ধ পেয়েই ধ'রে নেয় অসীম আজকের কেনাকাটা—দু'জনেরই পছন্দসই বস্তুর। অসীমের মিষ্টি, আর মল্লিকার ফুল।

ওদের ফ্ল্যাটে ফিরেই দেখে ভোলা দরজায় ঠেস দিয়ে ব'সে ঝিমুচ্ছে। ওদের দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে—একেবারে অবাক। ওদের দু'জনেরই হাসিখুসি ভাব, পোষাক-ইত্যাদি সবই ওর কেমন যেন অদ্ভুত লাগে—নতুন বিয়ে ক'রে এলে যেমন দেখায়।

ভোলাকে আজ রাতের বিশেষ বিশেষ মেনুর কথা বুঝিয়ে দিয়ে মল্লিকা শোবার ঘরে ঢোকে। অসীম সোফায় বসে পড়ে। পর্যা-লোচনা করার চেষ্টা করে সমগ্র ব্যাপারটার। মল্লিকার আচরণ শুধু অদ্ভুতই লাগে না ওর, কিছুই যেন বুঝতে পারেনা ও। তবু সাফল্যের আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠে অসীম।

মল্লিকা খুব যত্ন ক'রে খাওয়ায় অসীমকে, বেশী ক'রে, জোর ক'রেই মিষ্টি খাওয়ায়। ভোলার অবাক লাগে। রাতে শোবার ঘরে ঢুকেই অসীম অবাক। সারা খাটটা ফুল আর ফুলের মালায় প্রায় ঢাকা প'ড়ে গেছে। মাথার দিকের জানলার সামনে ফ্লাওয়ার ভাসে টকটকে লাল গোলাপের তোড়া। ব'লেই ফেলে অসীম—"কি গো আজ তোমার ফুলশয্যা নাকি ?" অপাঙ্গে তাকিয়ে জবাব দেয় মল্লিকা—"আমার নয়, 'আমাদের'। আর আজ ফুলশয্যা নয়, আজ বিয়ে। মনে নেই আজ আমাদের বিয়ের তারিখ।" —বলেই অসীমের হাত

ধ'রে টান দিয়ে বসিয়ে দেয় বিছানার উপর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে অসীম। মল্লিকা অবাক্ হয়। সোজা ওর নিজস্ব দেরাজটি খুলে—একটা প্যাকেট্ বার ক'রে আনে অসীম। মল্লিকার হাতে দিয়ে বলে—"খুলে দেখ পছন্দ হয় কিনা ?" দেখেই বুঝতে পারে মল্লিকা, বলে ওঠে – কখন কিন্‌লে ?" "গতকালই এনেছিলাম। আজ দেব ব'লে"– হাসতে হাসতে বলে অসীম। সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটা খুলে শাড়ীটা বুকে চেপে ধরে মল্লিকা, চোখ দুটো বুজে থাকে। একটা শাড়ী পেয়ে এত আনন্দ এর আগে আর কখনই প্রকাশ পায়নি মল্লিকার আচরণে। অসীম অবাক হয়। চোখ খুলে শাড়ীটা সামনে মেলে ধ'রে—মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় মল্লিকা। বলে—"লাভলি। এত চমৎকার তোমার পছন্দ যে বলার নয়।" মজা ক'রেই জবাব দেয় অসীম— তা না হ'লে তোমাকে দেখেই কি পছন্দ ক'রে ফেলতাম ?" 'থাক, থাক, কে আগে পছন্দ ক'রেছিল—তা আর জানতে বাকী নেই কারো।" আবার যোগ দেয় মল্লিকা—"সত্যি, এমনি ফ্লেম কালারের জমি, তাতে হলুদ আর কালোর পাড় আর আঁচলা—এমন কম্বিনেশন চোখেই পড়ে না। চমৎকার শাড়ী, তার চেয়ে চমৎকার—আজকের দিনটিতে পাওয়া।"

আলতো ভাবে অনুরোধ করে অসীম—"পরো না শাড়ীটা।" শাড়ীটাকে আবার বুকে চেপে রেখে বলে মল্লিকা—"আজ থাক, লক্ষীটি, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে—কাল প'রবো।" "আজ তো বিয়ের রাত······", বাকীটা বলতে হয়না অসীমকে। মল্লিকা ব'লে ওঠে—"হ্যাঁ, আর কাল 'কাল-রাত্রি'।" আপোষ ক'রতেই হয় অসীমকে। ওরা শুয়ে পড়ে। রাতটা কেটে যায় প্রায় না ঘুমিয়েই। মল্লিকা যেন আজ 'অভিন্ন' হয়েই থাকতে চায়। এত আদর—অসীম মনে ক'রতে পারে না—বিয়ের পর কোনদিন মল্লিকা ওকে ক'রেছিল কিনা। অবাক লাগে। ও ঘুমিয়ে পড়ে ভোরের দিকে, মল্লিকা তাকিয়ে থাকে ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে।

পরের দিন অফিসে ঢুকতেই—ম্যোটা সাহেবের ঘরে ডাক পড়ে

অসীমের। "ইউ, ন্যটি বয়—তোমার স্ত্রীর কথা একেবারেই চেপে গিয়েছিলে! আমি ভেবেছিলাম—তুমি ব্যাচেলার। যাই হোক্, এই সানডে, তোমরা দু'জনে আমাদের গেস্ট। সকাল সকাল চলে আসবে। সারাদিন গল্প করা যাবে। না, না, কোন কথা শুনতে চাই না।" অগত্যা অসীমকে মেনে নিতে হয়। সেও বলে – "আপনাদেরও আসতে হবে কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটে।" "ওঃ স্যুয়োর, তুমি না বললেও যাব।" তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন—"ল্যুক মিট্রা, শুধু কাজই জীবনকে ভরিয়ে রাখে না, তার ফাঁকে জীবনটাকে নানাভাবে, নানা পরিবেশে চেখে চেখে দেখতে হয়। তুমি তো সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবেই থাক আমি লক্ষ্য করেছি। তারপর ক্লাব হয়ে অনেক দেরীতে বাড়ী ফের, তাও খবর পেয়েছি। দিস্ ইজ্ ব্যাড্। এবার থেকে অফিস শেষে সোজা বাড়ী ফিরবে, তারপর ক্লাবে যেতেই যদি হয় মিসেস্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাবে। অল্ রাইট ?" "হ্যাঁ"-সূচক ঘাড় কাত করে অসীম মিঃ ম্যেটার আন্তরিকতার অভিব্যক্তির জবাবে। মনে মনে সে যে আগে থেকেই তা' স্থির ক'রে রেখেছে— তা আর বলে না। ওর সাফল্যের আনন্দে ও সারাটা দিন বিভোর থাকে। নিজেদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে ওর রিসার্চের সাফল্য।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফেরে অসীম—হাতে ওর একটা টাট্‌কা গোলাপের তোড়া। কলিং বেলটা টিপে অপেক্ষা করে—মল্লিকা কখন খুলে দেয় দরজা হাসতে হাসতে। ভোলা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাইরে চলে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবার বেল টেপে ও। ভাবে মল্লিকা বোধ হয় বাথ-রুমে। তবু আর একবার বোতামটায় চাপ দেয়। তারপর অকারণেই দরজাটায় হাত রাখে। দরজাটা খুলে যায়। ও বিরক্ত হয় ভোলার উপর। ভাবে, মল্লিকা নিশ্চয়ই এখনও বাথরুমে, আর হতভাগাটা দরজাটা ভেজিয়ে রেখেই বেরিয়ে গেছে। আজ সে ফিরলে ব'কে দিতে হবে।

"মল্লিকা, মল্লিকা"—বলে ডাকতে ডাকতে—শোবার ঘরের

দিকেই এগিয়ে যায় অসীম, প্রথমে ফুলের তোড়াটা আগে থেকে জায়গামত রেখে দিয়ে মল্লিকাকে অবাক ক'রে দেবার মতলবে। দরজার সামনে গিয়েই থামতে হয় ওকে। থেমেই থাকে, প'ড়ে যায় না। তার গত রাতে উপহার দেওয়া শাড়ীটাই আগে চোখে পড়ে। সেইটা প'রেই তো ঝুলছে দেহটা—সিলিং ফ্যানের রড্ থেকে।

ফুলের তোড়াটা সমেত ও ব'সে পড়ে বিছানার উপর। সামনেই নজর পড়ে বিছানার মাঝখানে তার ক'দিন আগে কেনা চওড়া ফ্রেমের পাওয়ার-লেস্ ফল্স চশমাটা চাপা দিয়ে রাখা—ছু' টুকরো কাগজ। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নেয় সে কাগজের টুকরো ছুটো। একটিতে লেখা—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়—মল্লিকা মিত্র"। অপরটিতে লেখা— পরের জন্মে এমন ভুল আর ক'রবো না গো।"

স্মৃতি

কমলেন্দুর বাড়ী যেদিন পৌঁছলাম, তখন ওর মাথায় আবার বড় বড় চুল গজিয়ে গেছে। ওর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণও। কিছুতেই আসতে পারিনি—এমনই অনাসৃষ্টি আমার পেশা। আজ প্রায় এক বছর পরে ছুটিতে এসে তাই দেখা করা আর ক্ষমা চাওয়া দুই-ই সারতে আসা।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়লো সামনে টিপয়ের উপর সযত্নে রাখা একটি ছোট্ট কাঁচের কেসের মধ্যে একটি সাদা তাজমহল। কেস্‌টির নিচের দিকে সাদা রং দিয়ে লেখা—"স্মৃতি।" ওপর থেকে ঝোলানো সাদা বেল-ফুলের মালা একছড়া কেসটির চারিদিকে জড়ানো। দেখে অবাক লাগলো। এ ধরনের তাজমহল দোকানে আর অনেক বাড়ীতে দেখেছি, কিন্তু এভাবে 'তোয়াজ' ক'রে সাজিয়ে রাখতে দেখিনি কোথাও।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কমলের মায়ের শেষ অসুস্থতার বিবরণ শুনতে শুনতে, জিজ্ঞেস ক'রে ফেললাম ঐ তাজমহলের ব্যাপারটা—যদিও বুঝলাম তাজমহল তো শুধু একটি শিল্পকর্মই নয়, একটি মহান স্মৃতিসৌধও বটে। কমল যেন একটু বিষণ্ণই হ'ল। বলল—"ওটা আমাদের পরিবারের একটা স্মৃতিরে—একটা নিদারুণ স্মৃতি।" ঘরের আবহাওয়াটা যেন একটু থম্‌থমে হয়ে গেল, তাই আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রতে সাহস হ'ল না। কমলের স্ত্রী তবু ব্যাপারটা সহজ করার জন্যই যেন বলল—"ঐ তাজমহল এখন থেকে বছরে তিনটি দিন মালা পরবে আমাদের বাড়ীতে। একুশে শ্রাবণ, পনেরই মাঘ, আর সাতই বৈশাখ। গতকাল ৭ই বৈশাখ গেছে, তাই ঐ মালাটি গতকাল পরানো হ'য়েছিল।" ব্যাপারটা কেমন যেন হেঁয়ালীর মত লাগল, তবু আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

এমনি সময় কমলের পিসিমা ঢুকলেন ঘরে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে। পাকা আমটি। টুকটুকে রং, মিষ্টি, নরম মানুষটি। আমার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল—বছর দশেক আগে—যখন উনি বিধবা হ'য়ে প্রথম এ বাড়ীতে থাকতে আসেন। উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ ক'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললাম—"কেমন আছেন, পিসিমা ?" উনি একটু হাসলেন, অর্থাৎ 'আমার আর থাকা-না-থাকা'। আমাদের আলোচনা বোধহয় কানে গিয়েছিল ওঁর ঘরে ঢোকার আগেই। খাটের এককোণে ব'সে প'ড়ে বললেন—"ঐ 'স্মৃতির' কথা হচ্ছিল না বৌমা ? তোমরা এর সব কথা ভাল ক'রে জানো না। আমিই বলি শোনো—ঐ তিনটি তারিখের কথা।" কমল বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে থাকলো। আমি একটু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুনে গেলাম—পিসিমার বলা কাহিনী।

বলতে বলতে পিসিমার গলাটা মাঝে মাঝেই ধ'রে আসছিল, তবু তিনি বলে চললেন—"তারিখটা ছিল ১৪ই মাঘ। বৌদি আর আমি ভেতরের দালানে দুপুরের রোদে পিঠ দিয়ে গল্প করছিলুম। আমরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী ছিলুমতো। বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, এক কমল ছাড়া, আর ওতো তখন মাত্তর বছর তিনেকের। দাদা আপিসে। হঠাৎ—বাইরে হাঁক শুনে বৌদি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। এক ফেরিওয়ালা মাথায় পেল্লায় এক ঝুড়িতে হরেকরকমের সওদা নিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ীর মধ্যে। বৌদির তখনও পুতুল কেনা সখ, বিশেষ ক'রে কমলের জন্যে তো দরকারই। এটা ওটা নাড়তে চাড়তে কাঁচের কেসের মধ্যে ভরা ঐ তাজমহলটা বৌদির খুব পছন্দ হয়ে গেল। দাম জানতে চাওয়ায় ফেরিওয়ালা বলতে নারাজ। বলে কিনা, টাকা নিয়ে সে বেচে না, পুরোনো শাল বা বেনারসী শাড়ীর বদলে ও সওদা বেচে। বৌদির কী খেয়াল হল, ট্রাঙ্ক খুলে একখানা পুরোনো বেনারসী বার ক'রে এনে দেখালো। ফেরিওয়ালা রাজি। দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেল। কমলের জন্যে একটা টিনের মোটর গাড়ী বাড়তি দিয়ে ফেরিওয়ালা চলে গেল।

তারপরই বৌদির খেয়াল হল—দাদা যদি রাগ করেন! বেনারসীটা পুরোনো এবং অকেজো হ'লেও বৌদির বিয়ের আগে থেকেই তো যত্ন ক'রে রাখা ছিল ট্রাঙ্কে। চিন্তিত হয়ে পড়ল বৌদি। ভয়ে ভয়েই সামনের কাঁচের আলমারীটার মধ্যে রেখে দিল তাজমহলটাকে।

"সন্ধ্যেবেলা দাদা আপিস থেকে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—কি কুক্ষণে কে জানে—আমি বলে ফেললুম ব্যাপারটা দাদাকে। দাদা তো শুনেই হতভম্ব। বললেন—"ওটাই আমার মায়ের ব্যবহার করা একমাত্র জিনিষ—যা আজও আমার সম্পত্তির মধ্যে ছিল। তুমি সেটাই এক কথায় দিয়ে দিলে অচেনা একটা লোককে সামান্য একটা খেলনা তাজমহলের জন্যে। ছিঃ ছিঃ!" দু'পা এগিয়ে গিয়ে দাদা তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ আলমারীর মধ্যে রাখা তাজমহলটার দিকে, তারপর বৌদির কাছে চাইল আলমারীর চাবিটা। বৌদি চুপ। ভয়ে কাঁটা। চাবি দেওয়া তো দূরের কথা, মুখে কথাটি সরছিল না। দাদার মাথায় যেন খুন চেপে গেল—"আমার মায়ের স্মৃতি তুমি এইভাবে হাতছাড়া করলে? তোমার বাধলো না একটু?" —বলেই মারলেন এক ঘুষি আলমারীর কাঁচে। কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার। দাদার হাত দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগলো। বৌদি যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পড়ি কি মরি ক'রে ছুটলো। ডেটল আর তুলো নিয়ে এলো ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জন্যে। দাদা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সে সব। রাতে কিছু খেলেন না। দালানে রাখা বাড়তি একটা তক্তাপোশের ওপর শুয়ে রইলেন। মশারী টাঙাতে পর্যন্ত দিলেন না। বৌদিও বসে রইল সারা রাত দালানের একপাশে—ভয়ে জড়সড় হ'য়ে। আমি মস্ত একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছি বুঝে সারারাত প্রায় পায়চারী ক'রেই কাটালুম। বৌদিও কথা বলে না, দাদাতো নয়ই। শেষ রাতে দাদা ছটফট করছেন দেখে কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা পুড়ে যাচ্ছে—বেহুঁশ অবস্থা। ভোর হতেই ডাক্তার ডাকা হল। তিনি কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে দেখে ঠোঁট উল্টে বললেন—"এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা

করুন।” একটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে তিনি চলে গেলেন—ফিজ্‌টাও নিলেন না।”

এবার একটু দম নিয়ে পিসিমা আবার আরম্ভ করলেন—চোখে জল টল্‌টল্‌ করছে তখন তাঁর। —“হাসপাতালে আর নিযে যেতে হ’ল না। সকাল আটটা নাগাদ দাদা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বৌদির তখন জ্ঞান নেই। আমি একা। কী যে করি কিছুই বুঝলুম না। পাড়ার ছেলেরা দাদার সৎকারের ব্যবস্থা করল। বিকেলের দিকে বৌদির জ্ঞান ফিরলো, কিন্তু তিন চার দিন প্রায পাগলের মত হযে রইল। আমি আরও ভয় পেয়ে গেলুম। কোন্ দিক সামলাই, যেন পাথর ব’নে গেলুম আমি। সমযেব সঙ্গে সঙ্গে সবই সয়ে গেল। বৌদি ছেলেকে নিযে পড়ল। তাকে ভাল ক’রে মানুষ করতে হবে। দাদার দরুণ সামান্য পেনসনের টাকায সংসার চলে না। আমরা দু’জনে বাড়ীতে সেলাই-এর কাজ ক’রে কিছু কিছু রোজগার করতে লাগলুম। সে সব অন্যকথা।”

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ বসে থেকে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে, পিসিমা আবার আরম্ভ করলেন—“বৌদি প্রায়ই ঐ তাজমহলটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে। আমি একদিন ওটাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলুম। বৌদি বাধা দিল। বলল—“ওটা যে ওঁর স্মৃতি ওঁর মায়ের স্মৃতির ধ্বংসস্তূপের উপর গড়া—ওটা কি আমি চোখের আড়াল ক’রতে পারি?” সেই থেকে বৌদি বছরে দু’টো দিন—মায়ের মৃত্যুর তারিখ, ২১শে শ্রাবণ, আর দাদার মৃত্যুর তারিখ, ১৫ই মাঘ—ঐ তাজমহলের কাঁচের কেসের উপর একটি ক’রে মালা পরিয়ে আস্‌ছিল, আমি বাধা দিই নি।”

একটু সহজ সুরে পিসিমা আবার আরম্ভ করলেন—“তারপর হঠাৎ আমার বিয়ে হয়ে গেল। চলে গেলুম শ্বশুরবাড়ী। কমল তখন স্কুলে পড়ে। তারপর যে-বছর হাতের নোয়া খুলে ফের এ বাড়ীতে এসে ঢুকলুম, তাতো তুমি জানই। সেই থেকে বাড়ী ছাড়া

হইনি। কমল কতবার বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। রাজি হইনি। তারপর কমলের বিয়ে হ'ল, বৌদি বৌ নিয়ে ঘরকন্না ক'রে গেল কয়েক বছর। একটি দিনের জন্যেও কিন্তু ঐ তাজমহলকে চোখের আড়াল করেনি, আর বছরে ঐ দুটো দিন ওতে মালা পরাতেও ভুল হয়নি কোন বারই।"

এবার আর কথা না বলে পারলাম না, বললাম "তারপর ?" পিসিমা বললেন—"তারপর গতবছর ৭ই বৈশাখ বৌদি গত হলেন। ঘাট থেকে ফিরে এসেই কমল ঐ তাজমহলটাতে একটা সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দিল। দিয়ে প্রণাম করল—কার উদ্দেশ্যে কে জানে! তার মায়ের, না তার বাবার, নাকি তার ঠাকুমার? গতকাল ৭ই বৈশাখ গেছে, তাই আবার একটি মালা উপহার পেয়েছেন ঐ তাজমহল—যার নিচে সাদা রং দিয়ে ও লিখিয়ে নিয়েছিল ঐ অক্ষর দুটি—'স্মৃতি'—ওর মায়ের 'কাজের' দিনই।"

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখি সকলের চোখেই জল টল্‌টল্‌ করছে। কমলের স্ত্রী বলে উঠলো—"আপনার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর এক কাপ ক'রে আনি।" বলেই যেন পালাল ঘর থেকে।

সঙ্গদোষ

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন সনাতনবাবু। অথচ এব অর্থটা ঠিক কী বুঝলেন না মোটেই। সারাটা দিন মনে মনে পর্যালোচনা ক'রেও সমাধানে ব্যর্থ হলেন।

সন্ধ্যেবেলা ছেলের মাষ্টারমশাই পড়াতে এলেন। ছেলের জ্বর—পড়বেনা আজ শুনেই বিদায় নিচ্ছিলেন ; সনাতনবাবু ডেকে বসতে বললেন। চা-টা অন্ততঃ না খেয়েই চলে যাওয়া ঠিক নয় ব'লে--বসালেন তাঁকে। মাষ্টারমশাই পণ্ডিত লোক—একটু নির্বিকাব গোছের, সজ্জন ব্যক্তি, ব'সে গেলেন। আলোচনা হ'তে থাকলো—নানা বিষয়ে, চা আসবার অপেক্ষায়। প্রথমে লেখা-পড়াব 'মান', পরে—কিঞ্চিৎ রাজনীতি, তারপর সমাজ ব্যবস্থা, তারপর আধুনিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে 'ছোঁওয়া-ছোঁওয়া' আলোচনা চললো। হঠাৎই সনাতনবাবুর মনে হ'ল—যে সমস্যাটির সমাধান তিনি করতে পারেননি সারাটা দিন ভেবেও—ব'লে দেখলে হয় মাষ্টারমশাইকে। বললেন—"আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো মাষ্টারমশাই। কিছুতেই বুঝে উঠতে পাবছি না ব্যাপারটা।" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করেন মাষ্টারমশাই।

সনাতনবাবু ব'লে চলেন—তাঁর আজ দুপুরের অভিজ্ঞতার বিবরণ। "আজ একটু হুগলী যেতে হয়েছিল—ছোট বোনের বাড়ী। ওর বাড়ী হুগলী ষ্টেশন থেকেই কাছে হয়, মাইলটাক্ রাস্তা। তাই ট্রেনে গিয়ে হুগলীতেই নামলুম। ভরা দুপুর—রোদ 'টা-টা' করছে। আমার বাইরে বেরুতে একটু দেরীই হয়েছিল, তখন অন্যান্য যাত্রীবা এগিয়ে গেছেন। একটিমাত্র রিক্সা ছিল বাইরে। আমাকে দেখে রিক্সাওয়ালা তার গাড়ীটা একটু এগিয়েই নিয়ে এলো। বলার দরকার ছিল না, তবু অভ্যাসবশে বললুম—"ভাড়া যাবে ভাই ?" ব্যস, রিক্সাওয়ালা চ'টে আগুন। হড় হড় ক'রে

রিক্সাটা পিছন দিকে ঠেলে একেবারে রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে, তাতে উঠে ব'সে পড়লো। আমি অবাক। বললুম—"কি হ'ল ভাই ?" ও আরও চ'টে গেলো—"গালাগাল আমার সহ্য হয় না। যাবোনা আমি আপনাকে নিয়ে।" আমি আরও অবাক, বললুম—"গালাগাল আবার কখন দিলুম ভাই ?" ও চোখ রাঙিয়ে বললো—"রিক্সা টেনে সংসার চালাতে পারি, কিন্তু আমরা ছোটলোক নই। আপনি আমাকে 'ভাই' বললেন কেন ? একবার নয়, দু'বার নয়, আপনি আমাকে তিন-তিনবার 'ভাই' বলে অপমান করেছেন। আমি কিছু বুঝিনা মনে করেন ? যাবোনা আমি আপনাকে নিয়ে।" আমি অবাক হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলুম—ও খেঁকিয়ে উঠলো—"যান্ বলছি—না হ'লে আমিও অপমান ক'রে ফেলবো আপনাকে।" অগত্যা হেঁটেই চ'লে যেতে হ'ল—ঐ এক মাইল রাস্তা—মাথার 'চাঁদি-ফাটা' রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে।" একটু দম নিয়ে আবার বলেন সনাতনবাবু—"আমি কিছুই বুঝলুম না—সারাদিন ভেবেও। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন মাষ্টারমশাই ? চ'টলো কেন ও 'ভাই' সম্বোধন শুনে ?"

মাষ্টারমশাই এতক্ষণ শুনছিলেন কথাগুলো মন দিয়ে। এবার একটু চিন্তিত ভাবেই কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। "লোকটা হয়তো বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলেছে, কিন্তু নেহাত মন্দ বলেনি লোকটি।" বলেই মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন তিনি। সনাতনবাবু আরও অবাক হন। মাষ্টারমশাই বলতে থাকেন—"একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখুনতো আমরা সত্যিকারের ভাইদের 'ভাই' বলি কিনা ; নাকি যাদের একেবারেই 'ভাই' মনে করিনা—তাদেরকেই 'ভাই' বলি।" সনাতনবাবু 'হাঁ' ক'রে থাকেন, শোনেন। "লোকটা আজ যা বলছে—হয়তো আগামী বিশ বছর পরে সকলেই তাই বলবে। ও শুধু একটু আগে আগেই ব'লে দিয়েছে—তাই আমাদের এতটা 'অদ্ভুত' ঠেকছে।" সনাতনবাবু এখনও অবাক। "তাহলে একটু ভাল ক'রেই আলোচনা করা যাক, কি বলেন ?" চায়ের

কাপে শেষ চুমুকটি দিয়ে মাষ্টারমশাই জাঁকিয়ে বসেন। বলেন—"যারা চাষ করে—তাদের 'চাষা' ছাড়া কিছুই বলার সংজ্ঞা ছিল না। তাই চাষাই বলতাম। পরে মনে হ'ল—ও কথাটা ওদের পক্ষে অসম্মানের, তাই 'চাষী' বলতে শুরু করলাম। আরও পরে, বিশেষ ক'রে আমাদের মধ্যের মতলববাজ লোকেরা ওদের 'চাষী-ভাই' ব'লে ডাকতে, সম্বোধন করতে শুরু করলেন। এখন এই 'ভাই' শব্দটি কতটা 'ভ্রাতৃত্ববোধক', আর কতটা—যাদের ছোটলোক মনে করি—তাদের তা বুঝতে না দেবার ফন্দিতে ব্যবহার করি, ভেবে দেখুন তো!" সনাতনবাবু 'কুঁই' 'কুঁই' ক'রে প্রতিবাদ করেন—"কিন্তু 'ভাই' বললে রেগে যাবে, এতো ভাবাই যায় না।"

মাষ্টারমশাই মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন, বলেন—"বললাম তো, সামনের বিশ বছর পরে 'ভাই' সম্বোধনটা যে এক্ষেত্রে অসম্মানের—এ কথাটা সবাই মানবে। একটা উদাহরণ দিই তাহলে। আমাদের বাড়ীতে যারা চাকরাণীর কাজ করে, আজকাল শিক্ষিত লোকেরা ঘুরিয়ে তাদের 'কাজের লোক' সংজ্ঞা দেন। বলেন—'কাজের লোক' আজ আসেনি। আগে আমরা কি বলতাম?" চট্ ক'রে জবাব দেন সনাতনবাবু "কেন, 'ঝি' বলতুম!" "ঠিক। আগে, অনেক আগে বলতাম 'মেয়ে', এখনও কোন কোন পুরনো সংসারের প্রাচীনা মহিলারা 'মেয়েই' বলেন। 'মেয়ে' মানেই 'ঝি', যেমন এখন যদি কেউ বলেন—'মায়ে-ঝিয়ে কি পরামর্শ হচ্ছে?' একথা শুনে সকলেই মনে করে এখানে ঝি কথার একমাত্র অর্থ 'মেয়ে'। কিন্তু, পুরনো দিনে কাজের লোকদের 'মেয়ে' বলে সম্বোধন করাতেই 'ঝি' কথার ব্যবহার চালু হয়, এবং তখন শব্দটা কোন পক্ষেরই খারাপ লাগতো না। কিন্তু এখন ঐ কাজের লোকদের কাউকে 'ঝি' বললে, সে মোটেই ভাবে না—তাকে 'মেয়ে' বলা হ'ল। ভাবে, তাকে হেয় ক'রেই ঐ 'ঝি' শব্দটি ব্যবহার করা হ'ল।" সনাতনবাবু অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকেন।

মাষ্টারমশাই ব'লে চলেন—

"তারপর ধরুন, 'ইতর' শব্দটি। এখন কাউকে 'ইতর' বললে—সে খুন ক'রে বসবে। অথচ এই শব্দটি সাধারণ ভাবে সাধারণ লোকের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হ'ত। 'মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ' প্রবচনটি না হয় বাদই দিলাম—আগেকার দিনে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ছিলেন ইতরজন। শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে 'থার্ড-পার্সেনের' ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আমি, তুমি, আমরা বাদে সবাই 'ইতর' জন। অর্থাৎ অন্যজন বা অপরজন। ঐ শব্দের প্রয়োগ তাই কারো উষ্মার কারণ ঘটাতো না। আর এখন তার কী হাল হয়েছে দেখুন।"

মাষ্টারমশাই—'মাষ্টারী' করার সুযোগ পেয়ে গেছেন ততক্ষণে। তাই, চালিয়ে যান—"দেখুন, সঙ্গদোষে যেমন মানুষ নষ্ট হয়, সঙ্গদোষে 'শব্দ'ও তেমনি 'খেলো' এবং অসম্মানের হয়ে যায়। 'ঝি' কথাটি সম্মানের এবং স্নেহের, কিন্তু, 'কাজের লোকদের' ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে করতেই—অসম্মানের হয়ে দাঁড়ালো। 'ইতর' শব্দটির অধঃপতনের কথা তো আগেই বলেছি। তেমনি 'ভাই' শব্দটি চাষা, মজুর, প্রভৃতি—যাদের আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জীব ভাবি—তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহাব করতে করতে সঙ্গদোষে ও শব্দটির ও অধঃপতন ঘটছে, এবং ওদের 'ভাই' বলাটা আর 'আপন' ভেবে বলা সম্বোধন নয় আসলে। দেখবেন বছর কয়েক পরেই 'ভাই' শব্দটির হাল ঐ 'ঝি' এবং 'ইতর' শব্দের মতই হ'য়ে দাঁড়াবে। রিক্সা-ওয়ালাটি একটু বেশী প্রগতিশীল হয়তো, তাই, এখনই ধ'রে ফেলেছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐ 'ভাই' শব্দটির যাদু দিয়ে—বাড়তি হিসেবে ওদের খাটিয়ে নেবার ফন্দিটা। উদাহরণ আরও অনেক আছে।"

সনাতনবাবু হাঁ ক'রে ভাবতে থাকেন, উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে থাকেন 'শব্দের সঙ্গদোষের' ব্যাপারটা।

সরস্বতী

অনেক দেখেশুনেই সুলক্ষণা বধূ ঘরে এনেছিলেন কল্যাণী-দেবী। নামেও সুলক্ষণা। বিশেষ ক'রে মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্যই সুবিমল রাজী হয়ে গিয়েছিল বিয়ে করতে—না হলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে তার আপত্তিই ছিল। এমনকি মায়ের সম্মতি আর বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও—বিয়ের আগে একবার সে গেলই না মেয়েটিকে দেখতে।

মায়ের অবাধ্য সে হয়নি কখনও—শুধু একটি বার ছাড়া। তাও সে খুব ছোট্ট বেলাতেই। মা যখন তার 'সুবিমল' নামটিকে ব্যবহারিক ক'রে নিতে গিয়ে বাড়ীতে তাকে 'সুবি' ব'লে ডাকতে শুরু করলেন—তখন সে আপত্তি জানিয়ে ছিল। বলেছিল, "ওটা মা মেয়েলি নাম, তোমার দেখাদেখি বন্ধুরাও ডাকতে শুরু করবে আমাকে ঐ নামে। পুরো নামটা না বলো—অন্ততঃ শুধু 'বিমল' বলে ডেকো।" মা হেসে সম্মতি জানিয়েছিলেন। দু'জনের সংসার সুখেরই ছিল। সেই সুখ, শাখা-প্রশাখা মেলে দিল সুলক্ষণার আগমনে। সে দু'হাত দিয়ে মায়ের সেবা-যত্ন আর সংসারের বাহার বাড়িয়ে দিল অল্প কয়েক দিনেই। দিনগুলো কাটতে লাগলো সুখে, শান্তিতে, আনন্দে। মধুময় হয়ে উঠলো ছোট্ট সংসারটি।

হঠাৎ কী যে ঘটে গেল—সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে কুলগুরু এলেন—কালীঘাটে কালী-দর্শনে। একটি রাতের জন্য অতিথি হলেন কল্যাণীদেবীর। গুরুদেব হাজার অনুরোধেও আসতে পারেন না, এলেও 'রাত্রিবাস' অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এবারে মা-কালীর কৃপায় একটা রাত তাঁকে পাওয়া—একটা ভাগ্যের কথা।

রাতের ফলাহারের পর—গুরুদেবের শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে কল্যাণীদেবী তাঁর পায়ের কাছে বসলেন—এমন 'একান্ত' ক'রে তাঁকে পাওয়া তো হয়ে ওঠেনা। ভক্তি-অর্ঘ যথাবিধি নিবেদনের

পর মনের একটা খেদ, একটা হতাশা—প্রকাশ ক'রে ফেল্লেন তাঁর কাছে। বললেন—"মানুষের সব সুখ তো হয় না বাবা, এত সুখের মধ্যেও একটা অতৃপ্তি সব সময়েই মনের মধ্যে কাঁটা-ফোটায়, কিছুতেই স্বস্তি পাইনা।" সহজভাবেই নিলেন গুরুদেব। বললেন—"দেখ, মানুষ একটা কিছু অভাব খুঁজে বার ক'রতে না পারলে স্বস্তি পায়না, অভাবের অভাবও তাকে পীড়া দেয়।" হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি। কল্যাণীদেবী এবার প্রকাশ ক'রেই বললেন ব্যথার কথাটা। "ছেলে আমার 'হীরের টুকরো',—জানেনই তো, বৌমাও হয়েছে একাধারে 'লক্ষ্মী-সরস্বতী'। তবু, দুঃখু আমার রয়েই গেল।" গুরুদেব সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেন তাঁর মুখের দিকে। কল্যাণীদেবী ব'লে চলেন—"পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেল—বৌমার আমার সন্তান হল না। জানিনা, ওদের সন্তান দেখে যেতে পারবো কিনা! কিছু জিজ্ঞেস করতেও সংকোচ হয়। অথচ সারাক্ষণ ঐ এক চিন্তাই আমার মনটা জুড়ে ব'সে আছে। কোন কিছুতেই"—আর বলতে পারলেন না কল্যাণীদেবী—চোখের কোণে জল দেখা দিল। গুরুদেব এবার মনোযোগ দিলেন। বললেন—'কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি, খুব ভোরে বৌমার ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে একবার আমার কাছে নিয়ে আসিস্ তো, একবার দেখবো ভাল ক'রে।"

ভোরে সুলক্ষণার ঘুম ভাঙতেই কল্যাণীদেবী তাকে গুরুদেবের ঘরে নিয়ে গেলেন। সুলক্ষণা গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে—পায়ের কাছে বসে। বসলেন কল্যাণীদেবীও। গুরুদেব বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বৌমার মুখের দিকে নীরবে। তারপরে বলেন—"দেখি দিদি তোমার হাতটি।" সুলক্ষণার দু'টি হাতই ভাল ক'রে দেখেন গুরুদেব। আবার তাকান তার মুখের দিকে, তারপর বলেন—"এবার তুমি এসো দিদি।" সুলক্ষণা আবার গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে, শ্বাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হয়ে যায় ধীরে ধীরে। মনটা তার কিন্তু কেমন যেন অপ্রসন্নই হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। একসময় কল্যাণীদেবী বলেন—"কী দেখলেন বাবা? নাতির মুখ দেখা আছে তো আমার কপালে?" আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গুরুদেব উঠে দাঁড়ান। বলেন—"আমার আর দেরি করা চলে না মা, 'ঘর যেতে' অনেক রাত হয়ে যাবে।" কল্যাণীদেবী আবার বলেন—"কেমন দেখলেন বাবা?" গুরুদেব হালকা সুরেই বলেন—"সন্তানস্থানে জটিলতা আছে ঠিকই, তবে হবে, একটি সন্তান হবে তোর বৌমার।" আর কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ান গুরুদেব। কল্যাণীদেবী ছেলেকে ডাক দেন। আগেই বলা ছিল। সুবিমল ট্যাক্সি ডেকে কুলগুরুকে হাওড়া ষ্টেশনে এনে, টিকিট কেটে, ট্রেনের কামরায় বসিয়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয়,—তাকে আবার তৈরী হয়ে নিয়ে অফিস যেতে হবে তো।

পরের দিন দুপুরেই কথাটা পাড়েন কল্যাণীদেবী। বৌমাকে কোলের কাছটিতে বসিয়ে বলেন—"প্রথম প্রথম সখ-সাধ মেটাবার নামে—আজকালকার ছেলে-মেয়েরা তাড়াতাড়ি সন্তান চায় না বৌমা। তোমরা কি কোন 'ব্যবস্থা' নাও? আমার কাছে লজ্জা পেয়ো না মা।" 'ক্ষণা মাথা নিচু ক'রে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর মৃদুস্বরে বলে—"না, মা"। "পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেল, বিমলের সঙ্গে কোন কথা হয়নি তোমার?" 'ক্ষণা এবারও বলে—"না, মা"। কল্যাণীদেবী আরও কিছু বলতে চাইছিলেন, বলতে পারলেন না।

দিন দু'য়েক পরে রাতের খাওয়া শেষ ক'রে শুতে যাবার সময়—কল্যাণীদেবী ছেলেকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। সুবিমল এটাই আশা করছিল—গত দু'দিন ধ'রে, 'ক্ষণার কাছে মায়ের উদ্বেগের কথা জেনে অবধি। ছেলে ঘরে ঢুকতেই তাকে নিজের বিছানায় বসিয়ে কল্যাণীদেবী বললেন—"তোকে কী বলবো খোকা, তোরা নিজেরাই বুঝছিস্ নিশ্চয়ই।" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—"গুরুদেব বললেন

—বৌমার বাচ্ছা হবার ব্যাপারে নাকি 'জটিলতা' আছে। আমি ব্যস্ত হচ্ছিলুম কিনা—প্রায় পাঁচ বছর হল তোদের বিয়ে হয়েছে," আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন— "আমি বলি কি—তোরা একটু পরামর্শ করনা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। আমি আর ক'দিনই বা আছি বাবা—নাতির মুখ দেখে যেতে পারবো না?" এতক্ষণ চুপচাপ ব'সে ছিল সুবিমল, এবার বললো—"তাই করবো মা।" কল্যাণীদেবী আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। বললেন—"রাত হয়েছে, শুয়ে পড়্‌গে যা।"

শনিবার বিকেলে 'সিনেমার' নাম ক'রে—সুবিমল 'ক্ষণাকে নিয়ে তার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে—সমস্যাটির কথা জানালো। তিনি নানা রকম পরীক্ষার ফিরিস্তি দিলেন—যা একদিনে হবার নয়, এবং বিশেষ ঝামেলা সাপেক্ষ। মা ঠিকই বুঝে ছিলেন, তাই পরের পরের কাজগুলো সারতে মায়ের কাছে আর গোপন করা হয়ে উঠলো না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং সেইসঙ্গে চিকিৎসা চলতে থাকলো যথারীতি, এবং মাও ক্রমশঃ ধৈর্য হারাতে থাকলেন সেই অনুপাতেই।

এইভাবে মাস ছ'য়েক কাটলো। কল্যাণীদেবী তখন এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। গুরুদেবের কাছে বিস্তারিত—অর্থাৎ ডাক্তারী চিকিৎসায় যে কোন ফলই হল না সে কথা লিখে, তাঁর মতামত এবং বিধান প্রার্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে, দিন পনেরো বাদে আবার লিখলেন। এবারে মিনতি জানালেন—যেন একটা ব্যবস্থা তিনি ক'রে দেনই।

চিঠি এল গুরুদেবের কাছ থেকে, নিদারুণ চিঠি। তিনি লিখেছেন—"তোর মুখের উপর বলতে পারিনি সেদিন, তোর বৌমার একটি সন্তান হবার কথা — যদিও অনেক জটিলতার মধ্যে দিয়েই। তবে সে-সন্তান হবে একটি 'ক্ষেত্রজ' সন্তান। তুই আঘাত পাবি বলেই সেদিন বলিনি, আগের চিঠিটার জবাবও দিইনি। কিন্তু, এখনও না বললে ধর্মচ্যুত হ'ব, তাই লিখে জানালাম। সম্ভব হলে

তুই ছেলের আবার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।” গুরুদেব মহাপণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি, দেবতুল্য লোক, কিন্তু সুদূর এবং নিভৃত পল্লীর অধিবাসী, সাবেকপন্থী, শহরের হাল-চাল তাঁর প্রায় অজানাই।

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল কল্যাণীদেবীর। রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের উপাখ্যান প'ড়ে প'ড়ে—আর যাই হোক 'ক্ষেত্রজ' সন্তান যে কী বস্তু সে ধারণা তাঁর খুবই হ'য়েছিল। সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি ব্যাপারটা। আবার, ছেলেকে “আবার” বিয়ে করতে বলতেও পারছিলেন না অমন সতীলক্ষ্মী বৌমাকে ত্যাগ ক'রে, গুরুদেব যত সহজে ঐ বিধানটি দিয়ে দিয়েছেন। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকেন তিনি দিনরাত। সুলক্ষণা কিছু না বুঝেই নির্বাক, বিষণ্ণ। সুবিমল কয়েকটা দিন অপেক্ষা ক'রে—মায়ের সেই চিরকেলে হাসিটির হদিস্ না পেয়ে, একান্তে একদিন মাকে জিজ্ঞেস ক'রে ফেলে তাঁর মনোবেদনার কারণ। মা-অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে, অনেকবার চোখের জল মুছে, ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে গুরুদেবের চিঠিখানি এনে দেন ওকে প'ড়ে দেখবার জন্যে, নিজে মুখে আর বলতে পারেন না। চিঠি প'ড়ে মাথাটা ঘুরে যায়—সুবিমলের। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে সে মায়ের কাছটিতে। কল্যাণীদেবী অঝোরে কাঁদতে থাকেন ছেলের পিঠে হাতটি রেখে। যেন এটাই বিধির বিধান, এর অন্যথা করার ক্ষমতা কারো নেই—মায়েরও না, ছেলেরও না—এমনি ভাব দু'জনের।

স্ত্রীকে কিছু না জানিয়ে ডাক্তার বন্ধুটির সঙ্গে পরামর্শ করে সুবিমল। দু'জনের অনেক অনেক মন্তব্য, অনেক অনেক প্রস্তাবই বাতিল করে দু'জনে—প্রায় এক সপ্তা' ধ'রে। রোজই তাই বাড়ী ফিরতে রাত হয় সুবিমলের। মা এবং স্ত্রী দুজনেই উদ্বিগ্ন হন—বিশেষ ক'রে তার মুখের চেহারা লক্ষ্য ক'রে। আলোচনা-পরামর্শের মধ্যে দিয়েই সুবিমলকে যেতে হয় একজন নামকরা স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ওর ডাক্তার বন্ধুটির সঙ্গে। তিনি শুধু ডাক্তারই নন—বৈজ্ঞানিকও বটেন। ব্যস্ত মানুষ। তবু তাঁর ছাত্র ডাক্তারটির

অনুরোধে—'সময়' দেন তাদের। সব কথা শুনে, এবং গুরুদেবের ভবিষ্যৎবাণী ও উপদেশ, মায়ের বেদনা এবং বাসনার কথা জেনে কয়েকটা দিন সময় চান ওদের কাছে। দিন পনেরো পরে ওরা যখন আবার যায়, তাঁর পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে প্রকাশ করেন।

দিন কাটতে থাকে। সুবিমল সস্ত্রীক মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় সন্ধ্যার পর, মা ক্রমশই অধৈর্য হন। ডাক্তারী ব্যবস্থায় যে কোন ফলই হবে না—এ বিষয়ে এখন কল্যাণীদেবী নিশ্চিৎ। শেষে একদিন ধৈর্য হারিয়ে বলেই ফেলেন সুবিমলকে—মেয়ে দেখার ব্যাপারে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। চুপচাপ তাঁর কথাগুলি শুনে যায় সুবিমল। পরে, আস্তে আস্তে বলে—"ক্ষণাকে তা'হলে ওর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও মা।" ছেলের অপ্রত্যক্ষ সম্মতি পেয়ে কল্যাণী-দেবীর খুসি হবারই কথা, কিন্তু তিনি বিষণ্ণই হয়ে পড়েন বৌমাকে ত্যাগ করতে হবে ভেবে। তবু, তা' ক'রতে হ'ল। পরের রবিবারেই সুবিমল বৌকে বাপের বাড়ী রেখে আসতে গেল দমদমে। ওর বড় শ্যালক এখন বাড়ীর কর্তা, দিলখোলা লোক, ব্যবসায়ী। কিসের ব্যবসা করেন তিনি, জানতে চাইলে ছোট্ট জবাব দেন—"হোয়াট্ নট্ ?"

কল্যাণীদেবী পাত্রীর সন্ধানে উঠে প'ড়ে লেগে যান। কোন পাত্রীই কিন্তু তাঁর পছন্দ হয় না। তাঁর আদরের বৌমাটির সঙ্গে মনে মনে তুলনা ক'রে—হতাশই হন তিনি—যতগুলি পাত্রী দেখেছেন ইতিমধ্যে। তবু চেষ্টা চলে। একদিন রাত্রে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলেন ছেলেকে—মাছের বাটিটা তার পাতে উল্টে দিয়ে—"এক জায়গায় বলছিল—বিয়ে তারা দিতে রাজী কিন্তু আগেরটার বিচ্ছেদ, মানে আইনের বিচ্ছেদ, না হ'লে তারা কিছুতেই এগোবে না।" ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় সুবিমল—"তাতো বটেই, আইনগত বিচ্ছেদ তো চাইই চাই।" এক কথায় ছেলের সম্মতি জেনে তিনি যেমন নিশ্চিন্ত হন, তেমনি অখুসি হন ছেলের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের ইচ্ছার কথা জেনে। তিনি যেন একটু ঘৃণাই ক'রে

বসেন ছেলেকে—যাকে তিনি এতকাল সব বিষয়ে একটি 'হীরের-টুকরো' ব'লে জেনে এসেছেন, ব'লে এসেছেন।

আজকাল প্রায়ই রাত হয় বাড়ী ফিরতে সুবিমলের। মা কিছু বলেন না, তার মনের অবস্থার কথা আন্দাজ ক'রে। আবার এক একবার ভাবেন সেও হয়তো পাত্রী খুঁজছে, অথবা কারও সঙ্গে 'ভাব' করেছে। এমনি ক'রে প্রায় পুরো একটি বছর ঘুরে গেল। এর মধ্যে কতদিন যে সুবিমল গভীর রাতে বাড়ী ফিরেছে, কতদিন যে সে অফিস কামাই ক'রে বাড়ীর বাইবে বাইরে কাটিয়েছে, আবার কতদিন যে সে রাতে মোটে বাড়িই ফেরেনি তার হিসেব স্নেহময়ী মা হয়েও রাখা সম্ভব হয়নি কল্যাণীদেবীর পক্ষে। সব মিলিয়ে তিনি অখুসিই হয়েছেন। সংসারটার চেহারা হঠাৎ কেমন বদলে গেল দেখে, বুঝে, তিনি হতাশ হয়েছেন, এমনকি নিজের জীবনের উপরও ধিক্কার জন্মে গেছে তাঁর। সুলক্ষণাকে তাড়িয়ে দিয়ে অবধি তিনি বা তাঁর ছেলে সেদিক মাড়াননি, কোন খোঁজ খবরও নেননি, এমনকি কোন খবরাখবর, চিঠিপত্রও না। মাসখানেক আগে বৌমার দাদা একবার এসেছিলেন। কি যেন কাজ ছিল তাঁর এদিকে। বোনের প্রসঙ্গ তোলেনইনি, এ বাড়ীতে তাঁর বোনের যে বিয়ে হয়েছিল, এবং এখন যে সে পরিত্যক্তা—এমন কোন ভাবই ফুটে ওঠেনি তাঁর কথাবার্তায় বা আচরণে।

একটা রবিবার সকাল সকাল স্নান আহার সেরে সুবিমল মাকে অনুরোধ করে—"চল মা এক জায়গায় ঘুরে আসি।" বহুদিন পরে এমনি অনুরোধ। ছেলেকে প্রফুল্ল দেখে রাজী হয়ে যান কল্যাণীদেবী। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেসও করেন না। আধঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নেন তিনি। ট্যাক্সীটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে দেখে ভাবেন ছেলে হয়তো তাঁকে কালীঘাট মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর যাবার পর তাও নয় বুঝে, ভাবেন হয়তো পাত্রী দেখতে। ভেবে যেন বিষণ্ণই হন।

পথে একবার ট্যাক্সীটাকে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড় করিয়ে সুবিমল

মাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখেই পিছনের একটা বড় দোকানে ঢুকে পড়ে। কিসের যেন একটি ছোট্ট বাক্স—ব্রাউন পেপার দিয়ে মোড়া—নিয়ে এসে মাকে দেয় রেখে দেবার জন্যে। কল্যাণীদেবী মনে করেন "মিষ্টির বাক্স।" তাঁর ছোট্ট ঝোলাটির মধ্যে রেখে দেন সন্তর্পণে। ভাবেন, ছেলে হয়তো তার কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী চলেছে মাকে নিয়ে।

ট্যাক্সীটা থামায় সুবিমল প্রকাণ্ড একটি বাড়ীর গেটের সামনে, লেকের ধারে, লেকের কাছাকাছি। ভাড়া মিটিয়ে মাকে নিয়ে সুবিমল গেটের মধ্যে ঢুকছে এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান ওঁদের। সাজ-পোশাক, প্রসাধন ছাপিয়ে তাঁকে চিনতে না পারলেও কল্যাণীদেবীর মনে হয যেন তাঁকে দেখেছেন কোথাও, যেন চেনা চেনা। মহিলাটি যখন তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চিবুকে হাত ছোঁয়াতে গিয়েই চিনে ফেলেন কল্যাণীদেবী। "মিনতি না ?" প্রশ্ন করেন তাকে। মিনতি প্রায় জড়িয়ে ধরে তাঁকে। কল্যাণীদেবী অবাক হন। তার চেহারায়, সাজগোজে, পোশাক-আশাকে যে আভিজাত্য ফুটে উঠছে তা' যে ওঁর সম্পূর্ণ অচেনা। আর তা' ছাড়া ওদের বাড়ীতো দমদমে, ওরা দক্ষিণ কলকাতার এই অভিজাত অঞ্চলের এই প্রাসাদোপম বাড়ীতে কোন সুবাদে ? বুঝতেই পারেন না তিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মিনতি ওঁদের নিয়ে গিয়ে সামনের বিরাট ড্রইংরুমে বসায়। "এক মিনিট, আসছি"—ব'লে ভেতরে চলে যায়। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে কল্যাণীদেবীর পাশটিতে ব'সে প'ড়ে কুশল প্রশ্ন করতে থাকে—"কতদিন দেখিনি আপনাকে। উনি নাকি কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন আপনাদের বাড়ী। তা, জিজ্ঞেস ক'রে তো তাঁর কাছ থেকে জবাব পাওয়া যায় না—সব সময় কাজ, কাজ আর কাজ, ব্যবসা আর ব্যবসা, ফুরসৎ কোথায় আত্মীয়-স্বজনের খবর নেবার, বা তা' বাড়ীতে এসে গুছিয়ে বলবার !"—অনর্গল ব'কে যায় মিনতি।

কল্যাণীদেবী তাঁর ছোট্ট ঝোলাটির মধ্যে হাত চালিয়ে দেন। সেই ছোট্ট বাক্সটিই যে তিনি বার করতে চাইছেন মিনতির হাতে দেবার জন্যে তা' বুঝে নিয়ে ইশারায় নিষেধ করে মাকে সুবিমল। কল্যাণীদেবী নিরস্ত হন, অবাকও হন। হঠাৎ মিনতি বলে ওঠে—"আসুন না মা ভেতরে"—ব'লে কল্যাণীদেবীর হাত ধ'রে প্রায় টেনে নিয়েই যায় তাঁকে বাড়ীর ভেতর দিকে। সুবিমল চুপচাপ ব'সে থাকে, মুখে তার মৃদু হাসি।

মিনিট খানেকের মধ্যেই প্রায় ছিট্‌কে বেরিয়ে আসেন কল্যাণী-দেবী ভেতর থেকে, সারা মুখ, সারা শরীর যেন ফুলে ফুলে উঠছে রাগে, অপমানে। তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডলে কে যেন আবীর ঢেলে দিয়েছে। এসেই ছেলেকে ধমক দেন—"এই দেখতেই এখানে আনলি আমাকে, লজ্জা করলো না তোর? মান-সম্ভ্রম, বিবেক-বুদ্ধি সবই কি খুইয়ে বসে আছিস এই একটা বছরের মধ্যে? চল্, ওঠ্ বলছি এক্ষুনি এখান থেকে, এই পাপপুরী থেকে বেরিয়ে চল্।" সুবিমল হাসি মুখেই উঠে দাঁড়ায়। মায়ের হাত দুটি ধ'রে তাঁকে শান্ত হয়ে বসতে অনুরোধ করে। বলে, "একটু শান্ত হও মা, এই অবস্থায় বাইরে বেরুলে লোকে দেখে কি ভাববে?" এমনি সময় বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। একসঙ্গে তিন আগন্তুক প্রবেশ করেন ড্রইংরুমে। কল্যাণীদেবী তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে চিনতে পারেন—সে প্রভাকর—মিনতির স্বামী, সুবিমলের বড় শ্যালক, সুলক্ষণার বড় দাদা। প্রায় ধপ্ ক'রেই বসে পড়েন কল্যাণীদেবী সোফাটার ওপর। তিন মূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বসেন অন্যান্য সোফায়। বসবার আগে প্রভাকর, আর সঙ্গের অন্য ছোকরাটি প্রণাম করে কল্যাণীদেবীকে। সঙ্গের তৃতীয় ব্যক্তিটি প্রৌঢ়। তিনি হাত তুলে নমস্কার জানান।

সকলেই চুপচাপ। ইতিমধ্যে চা আর কফি এসে গেছে—যার যেটা পছন্দ। কল্যাণীদেবীর কোনদিকেই মন নেই। তিনি তখন জ্বলছেন ভেতরে ভেতরে। হঠাৎ প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ব'লে ওঠেন—

"কেউই যখন মুখ খুলছো না, তখন আমিই শুরু করি, আর সেই জন্যেই যখন আমাকে এখানে আনা।" তিনি 'বক্তৃতা' শুরু করেন—কল্যাণীদেবীর দিকেই তাকিয়ে। "মাসীমাই বলি আপনাকে, এরা সব যখন আমার ছোট ভাইয়ের মতই। আপনার গুরুদেবকে এখান থেকেই প্রণাম জানাই মাসীমা। আমাকে কিন্তু একবার তাঁর দর্শন পাইয়ে দিতেই হবে।"

কল্যাণীদেবী যেন একটু নরম হয়ে পড়েন। পরের কথাগুলি তাই তাঁর কানে ঢোকে সহজেই।

"তিনি যে বলেছিলেন—সুলক্ষণার বাচ্ছা হবার ব্যাপারে 'জটিলতা' আছে—তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, আর তার যে একটি সন্তান হবে—তাও ঈশ্বরের মতই সত্য। আর সে বাচ্ছাটি যে একটি 'ক্ষেত্রজ' সন্তান—তাও বিস্ময়করভাবে সত্যের কাছাকাছি, যদিও শাস্ত্রমতে বা বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক সত্য নয়।"

কল্যাণীদেবীর মুখ চোখ আবার 'লাল' হ'য়ে উঠতে থাকে, তবু চুপচাপ শুনে যান।

"আমি একজন ডাক্তার, স্ত্রীরোগ নিয়েই আমার কাজ-কারবার।" সঙ্গের ছোকরাটিকে দেখিয়ে বলেন—"এই ছেলেটি ডাঃ অমলেশ সান্যাল—আপনার ছেলে সুবিমলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র। ওদের দু'জনের মুখে—আমি আপনার গুরু-দেবের ভবিষ্যৎবাণীর কথা শুনি, এবং সুলক্ষণাকে পরীক্ষা ক'রে তার প্রথম অংশটি অর্থাৎ 'জটিলতার' কথা মেনে নিতে বাধ্য হই। তারপর, একটা 'বিহিত' করার মতলবে আমরা সকলে—সুবিমল, অমলেশ আর আমি পরামর্শ চালাতে থাকি। মোটামুটিভাবে আমাদের পরিকল্পনাটি প্রভাকর বাবুকে শুধু শোনানো ছিল, এবং বলা ছিল — তিনি যে কিছু জানেন তা যেন কাউকে না বলেন, সুলক্ষণার সম্বন্ধে কোথাও কারও কাছে কোন আলোচনা না করেন, প্রসঙ্গও উত্থাপন না করেন। এই কারণে তাঁরা তাঁদের দমদমের বাড়ী বিক্রী ক'রে এখানে বাড়ী কিনে যে বেশ জাঁকিয়ে

বসেছেন এটুকুও আপনাকে জানানো যায়নি — পাছে সুলক্ষণার প্রসঙ্গ উঠে পড়ে, বা আপনি কোন কারণে যোগাযোগ ক'রতে পারেন।”

কল্যাণীদেবী নিরীহ চোখে তাকিয়ে থাকেন।

“এবার আসল কথায় আসা যাক। আমরা, মানে আমি, অমলেশ এবং আমার সহযোগী আর একজন বিশেষজ্ঞ—নানাভাবে প্রায় ছ'মাস ধ'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, সুলক্ষণার সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকলেও গর্ভবতী হবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সে বাধা দূর করা অসম্ভব। অথচ, একটি সন্তান চাই-ই চাই, এবং তা' সুলক্ষণার গর্ভেরই হওয়া চাই, আর হওয়া চাই আপনার পুত্র সুবিমলেরই ঔরসজাত। এখন, এবম্বিধ সমস্যার সমাধানের একটি মাত্রই পথ—আমরা অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলাম—যদিও সে পথে অনেক বিপদ, অনেক সমস্যা, অনেক ঝামেলা।”

কল্যাণীদেবী একবার যেন 'ঢোঁক' গেলেন, চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন।

“তার পরের অংশটুকু আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না মাসীমা। সেটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এবং দারুন জটিল কাণ্ড-কারখানা। তবে, এটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি এবং তাই বলতেই আজ আমার এখানে আসা—আপনার বৌমা আমার নার্সিং হোমে পুরো একটি বছর অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ আপনি যখন ওকে 'ত্যাগ' করেন—ওর স্বামীদেবতাটি তখন ওকে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে সমর্পণ করেন—পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই—তার বাপের বাড়ীতে না পাঠিয়ে। আমাদের গবেষণা আগে থেকেই চলছিল। মাস দেড় দুই বাদে আমরা ক'জনে এক অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম। অর্থাৎ আপনার পুত্রেরই ঔরসে আপনার পুত্রবধূর গর্ভে কৃত্রিম উপায়ে একটি সন্তান উৎপাদন। আজ সাতদিন হ'ল সুলক্ষণা এ বাড়ীতে এসে

আছে তার কন্যারত্ন—'সরস্বতী'কে নিয়ে সোজা আমার নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়েই। আমার গল্পটি ফুরোল, এবার আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝুন—এই রইল আমার 'কৈফিয়ত' এবং 'সার্টিফিকেট্।' এখন এই বাচ্ছাটিকে আপনি আপনার গুরুদেবের ভাষায়—'ক্ষেত্রজ' বলতে চান বলুন। কিন্তু আসলে এই সন্তান আপনার পুত্রবধূরই গর্ভে এবং আপনার পুত্রেরই ঔরসে জন্মলাভ করেছে, যদিও এই গর্ভসঞ্চার কৃত্রিম পদ্ধতিতে ঘটানো হয়েছে। আপনি আপনার গুরুদেবকে বলতে পারেন—পুরাণের আর এক 'সরস্বতীর' আবির্ভাব ঘটেছে এখানে। চললাম। নমস্কার। আমার সঙ্গে কিন্তু আপনার গুরুদেবের একটু সাক্ষাৎ করিয়ে দিতেই হবে মাসীমা।" ভদ্রলোক সত্যই উঠে পড়লেন। কল্যাণীদেবী মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ালেন। হাত দু'টি তাঁর যুক্ত; করজোড়েই শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি নির্বাক স্থাণুর মত।

ইতিমধ্যে মিনতি কখন যেন বাড়ীর ভেতর থেকে সুলক্ষণাকে নিয়ে এসে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেছে—কোলে তার একটি ফুটফুটে মেয়ে পুট্‌পুট্‌ ক'রে তাকাচ্ছে। কল্যাণীদেবী এগিয়ে গিয়ে বাচ্ছাটিকে নিজের কোলে নিয়ে নেন। সুলক্ষণা নত হ'য়ে প্রণাম করে শ্বাশুড়ীকে। তার চোখে জল, জল কল্যাণীদেবীর চোখেও, আর তার প্রতিফলনে সুবিমলের চোখও আর্দ্র।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রভাকর নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার ক'রে ওঠে—"গুরুদেবকি জয়। কী খাওয়াবেন বলুন মা? নাত্‌নীর মুখ তো দেখা হ'ল।" সুবিমলের মনে পড়ে যায়। সে উঠে এসে মায়ের সেই ছোট্ট ঝোলাটি থেকে সেই কাগজ-মোড়া বাক্সটি বার ক'রে মায়ের হাতে দেয়। মোড়ক খুলে কল্যাণীদেবী দেখেন তার মধ্যে ভেলভেটের কাস্‌কেটে এক জোড়া সোনার বালা — ছোট্ট ছোট্ট। পরিয়ে দেন তিনি সে দু'টি, কচি মেয়েটির কচিকচি হাত দু'টিতে।

দৃষ্টিকোণ

বীরটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে মোটা ডালটায় বসেছিল, চোখ দু'টি বুজে ঝিমুচ্ছিল। অন্যসব ডালে চার পাঁচটা মাদী লাফালাফি ক'রছিল। ঠিক উপরের ডালটায় একটা বাচ্ছা তার মাকে বিরক্ত ক'রছিল। কাঁধে মাথায় বুকে লাফিয়ে উঠছিল, লাফিয়ে নেমে প'ড়ে আবার উঠছিল—দুধ খাবার বায়না। কিছুক্ষণ সহ্য ক'রে মা তাকে দু'হাতে ধ'রে দুম ক'রে বসিয়ে দিল পাশের ডালটার উপরে। তড়াক ক'রে নেমে নিচের ডালে নিরীহের মত ব'সে থাকলো 'মা'টি এক মিনিট। তারপর গুটিগুটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বীরটার কাছাকাছি। চোখ দু'টো সামান্য একটু খুলে দাঁত খিঁচলো বীরটা—ভাবটা যেন বিরক্ত করিস্‌নে বলছি। ভয়ে ভয়ে আরও একটু এগিয়ে এল মাদীটা। বীরটা মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

অনুযোগের সুরেই যেন বললো মাদীটা—"একটু কাছে এলেই বিরক্ত হও তুমি, অথচ চোখের সামনেই দেখতে পাও—মানুষগুলো কেমন আদর-যত্ন করে তাদের বৌদের।" "হাসালি ছুট্‌কি"—চোখ না খুলেই বলে বীরটা। ফোঁস্ ক'রে ওঠে মাদীটা। "ছুট্‌কি-ছুট্‌কি বলবেনা বলছি। কেন ? আমার নাম নেই নাকি ?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ মানুষদের মেয়েদের মতন একটা নামও যোগাড় করেছিস্ জানি। কী যেন নামটা ? 'চামেলী' ? —হ্যাঁ, হ্যাঁ, চামেলীই তো। মনে থাকেনা বাপু অতশত। তা, যা-ইচ্ছে তাই কর্, কেবল ন্যাকামীটি করতে আসিস্‌নি আমার কাছে। সহ্য হবে না। ঐ মেদিমারা মানুষগুলো যে কি ক'রে সহ্য করে !"

কোমর বেঁধেই যেন লড়াইয়ে নামে মাদীটা। বলে—"ওদের সঙ্গে আর তুলনা করতে যেওনা। ওরা কেমন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে……" আর বলতে হল না। বীরটা ব'লে ওঠে—

"ওঃ, তাই বল্, তোরও ইচ্ছে হয়েছে পোশাক পরার ! তা ধরা দিগে যা না। কেমন ঘাগ্‌রা পরিয়ে নাচিয়ে বেড়াবে ছড়ির তালে তালে।" আক্ষেপের স্বরে যোগ করে—"তোদের যে আজকাল কী হয়েছে, বুঝিনে। নিজেদের জাত-ধম্ম সব ভুলে যেতে চাস্ ! আরে, ওরা সব উচ্ছন্নে গেছে। সুখ-শান্তির আশায় ছুটোছুটি ক'রে অশান্তিই বাড়িয়ে তুলছে নিজেদের জীবনে। ঐ সব পোশাক-আশাক প'রেও ওরা সুখে আছে নাকি ? নাকি বাড়ী-ঘর বানিয়েই শান্তিতে আছে ? এই যে আমাদের পোশাক লাগেই না—কোন্ অসুবিধেটা হয়েছে বলতো ? গাছের ডালে ডালে আমরা কোন্ অসুবিধে বোধ করছি ? রোদে জলে আমাদের যেটুকু অসুবিধে হয়—তার চেয়ে ওদের হয় চতুর্গুণ। আবার শুনছি, ওদের মধ্যেও যারা একটু সভ্য হ'য়ে আসছে—তারা পোশাক-আশাক ত্যাগ ক'রে আমাদেরই নকল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আরে বাপু, তা' কি পারে নাকি ? ও জাতটার গোড়াটাই যে বরবাদ হয়ে গেছে।"

এতগুলো কথা এক সঙ্গে কয়নি কোনদিন বীরটা। তাই যেন একটু প্রশ্রয় পেয়ে যায় মাদীটা। আশে পাশে একবার তাকিয়ে নেয়, সতীনদের মধ্যে কেউ দেখছে কি না। তারপর একটু গা ঘেঁসে এসে বলে সোহাগের স্বরে—"আমরা বেশ আছি কি বল ?" আব্দারের স্বরে যোগ করে,—"তা বলে একটু আদর যত্ন করা, সেটা তো আর এমন বেশী কিছু নয় ?" ধম্‌কে ওঠে বীরটা—"মান্‌ষামী করিস্‌নে ছুট্‌কি। আমরা কেউ ওদের মত স্ত্রৈণ নই। ওদের প্রথম যখন অধঃপতন ঘটে, তখন ঐ স্ত্রৈণত্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। আর ঐ কারণেই ওদের যত অশান্তি। ওদের মধ্যে যিনি সব থেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র (কপালে হাত ছুঁইয়ে নিয়ে)—বছর কয়েক আমাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে শেষে বুঝতে শিখেছিলেন এতদিন কী ভুলই না করেছিলেন ?" "তাই বুঝি সীতামায়ের অত খোয়ার হ'য়ে ছিল শেষের দিকটায় ?"—ব্যথিত স্বরে অনুযোগ করে মাদীটা।

মুখ ভার ক'রে বসে থাকে মাদীটা বেশ কিছুক্ষণ। একটু যেন দয়া পরবশ হয়েই বলে বীরটা—"দেখ্ আমরা অনেক উন্নত জাত। আমরা মানুষের চেয়ে অনেক সুখী। আমাদের অভাব কম, আর ওরা নিত্য নতুন অভাবের সৃষ্টি ক'রে কষ্ট পাচ্ছে। ওরা অভাবেও কাঁদে, আবার অভাবের অভাবেও কাঁদে। ওরা যেন কাঁদবার জন্যেই জন্মেছে। আমাদের কাউকে কাঁদতে দেখেছিস্ কোনদিন ? আমরা সামান্য যা কিছু খাই—তার জন্যে মেহনত করতে হয় আমাদের সামান্যই। পাড়ো আর খাও। আমরা যা-ই খাই তা নির্ভেজাল। আর ওরা বোকার মত ভেজাল না মিশিয়ে কিছু খায়ই না। খায় যতটা, হজম করবার জন্যে ওষুধ খায় তার ডবল। আমরা সব কিছুই—কি ঘটবে না ঘটবে—ওদের থেকে আগে, অনেক আগেই বুঝতে পারি। আর ওরা নিত্য নতুন যন্তর বানিয়েও কত পিছিয়ে যাচ্ছে দিন দিন।"

সাহস বেড়েই চলে মাদীটার। এগিয়ে এসে বীরটার কানের পাশে সুড়সুড়ি দেয় সোহাগ-ভরে। বড্ডই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে ক'রে ফের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে বীরটা। স'রে গিয়ে লাফিয়ে অন্য ডালে বসবার আগে ছোট্ট ক'রে একটি চড় কষিয়ে যায় মাদীটাকে। মনমরা হয়ে ব'সে থাকে মাদীটা। কাছের ডালটার ডগা থেকে একটা অপুষ্ট ফল ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে যায়। তড়াক্ ক'রে নেমে এসে যেন দয়া-পরবশ হয়েই ফলটা কেড়ে নেয় বীরটা। মুখে পুরে দিয়ে আস্বাদনের চেষ্টা করে। ভাল না লাগায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফলটা। জুল্‌জুল্ ক'রে চেয়ে থাকে মাদীটা। "তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, ছুট্‌কি। পুরুষের পৌরুষ এখনও বুঝলিনে। মানুষগুলো জোড়ায় জোড়ায়—বিশ পঁচিশটা বর-বউ একটা মস্ত ঘরে ঢুকে জড়াজড়ি, গলাগলি, ঢলাঢলি ক'রে নেচে-কুঁদে আবার জোড়ায় জোড়ায় ঘরে ফেরে মুখ ভার ক'রে। আর এই আমার তো এখন মোটে ছ'টি মাত্তর বৌ। আসুক দেখি কোন মরদ্ তাদের কারো ধারে কাছে। ফেড়ে ফেলবো না একেবারে—

ছ'হাতের নখ দিয়ে। ওদের সে-পৌরুষ আছে? না ইজ্জতের বালাই আছে?" মাদীটা অনুযোগ করে—"ছ'টিতেও তো তোমার মন ওঠে না!" মাথার উপর দিকটা 'লরেলের' ঢঙে একটু চুলকে নিয়ে—এক গাল হেসে বীরটা বলে—"তা যা বলেছিস্। দলের আরও ছুটো মেয়ে প্রায় তৈরী হ'য়ে এসেছে।"

"ওরা কিন্তু এদিক থেকে খুব ভাল। একটি ক'রে বৌ নিয়েই সব কেমন সুখে ঘর করে"—অভিমানের সুরে বলে মাদীটা। "পাগল হ'লি নাকি? ও সব লোক দেখানো ব্যাপার। আসলে, ওদের মনটা প'ড়ে থাকে অন্যের বৌয়ের দিকে। আর এই নিয়েই তো যত অশান্তি। মুখে এক আর মনে অন্য। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস, ওদের মধ্যে পুরুষ বলে কেউই নেই—সবই মাদী।" "সেটা কি রকম?" প্রশ্ন করে মাদীটা অভিমান ভুলে গিয়ে। "এটাও বুঝলি না? তাকিয়ে দেখ্ চারিদিকে। সব প্রাণীরই পুরুষদেরই দেখতে ভাল। কত বাহার! কেমন পুরুষালি চেহারা! বাঘ, সিংহ, হরিণই বল্, মোরগ, ময়ূর আর পায়রাই বল্, আর কুকুর, বেড়াল, গাধা, ঘোড়া, মায়—সেই গরু পর্যন্ত পুরুষদের দেখতে কেমন জমকাল—পুরুষালী ভাব। আর মানুষরা? পুরুষগুলো পুরুষালী চিহ্নগুলো সব চেঁচেছুলে মাদী সেজে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে। আর পোশাকের ব্যাপারেই দেখ্ না—ওদের মেয়েদের যতটা না হলেই নয়, আর পুরুষদের স্বভাব আপাদমস্তক ঢেকে সাজানো-পৌরুষ প্রকাশ করা।"

ইতিমধ্যে আবার যেন ভাব হ'য়ে গেছে। মাদীটা হাত বাড়িয়ে বীরটার কোমরের কাছ থেকে একটা উকুন পট্ ক'রে ধ'রে নিয়ে দাঁত দিয়ে কট্ ক'রে কেটে ফেলে দেয়। বীরটা একবার কোমরটা চুলকে নেয়—আরামের চোখ-বোজা ভঙ্গিতে। পাশের ডালের আর একটা মাদী ধীরে ধীরে কাছে আসে। বীরটা তাকেও দাঁত খিঁচোয়—"তোকে আবার মান্ষামীতে পেল নাকি? কাছে ঘেঁসিস্‌নে বুড়ি। বাচ্ছা সামলাগে যা। নইলে শেষ ক'রে ফেলবো আগের দুটোর

মত।" বুড়িও কম যায় না। বলে ওঠে—"তোমার মুরোদও বোঝা গেছে। আমাকে আবার বুড়ি বলা হচ্ছে! কতদিন কত মাস কাছে আসোনি—খেয়াল আছে?" বীরটা এবার খেঁকিয়ে তেড়ে যায়। ব'লে ওঠে—"আমাকে তুই মানুষ পেয়েছিস নাকি? দিন নেই, ক্ষণ নেই, বারমাস তিরিশ দিনই—'কাছে ঘেঁসতে' হবে?"—বলেই তড়াক ক'রে উঁচু ডালটায় উঠে গিয়ে পিছন ফিরে বসে আরাম ক'রে।

বুড়ির শোক উথলে ওঠে। ধীরে সুস্থে বীরটার কাছে চলে এসে বলে—"কি নিষ্ঠুর তোমরা—নিজের ছেলেদের নিজেরা নিজেদের হাতে মারো কেমন ক'রে?" "মারি কি আর সাধে?"—সাফাই গায় বীরটা—"মারি প্রাণের দায়ে। নইলে ওরাই মারতো আমাকে এতদিনে। এমনিতেই এক গ্রাধটা ছিট্‌কে গিয়ে পালিয়ে বেঁচে গেল। একটু জোয়ান হয়েই আমাকে মেরে বা তাড়িয়ে গোটা দলটাই দখল ক'রে নেবে। আর এই তোরা—এখন যেমন আমাকে সোহাগ জানাতে আসিস্, ঠিক তেমনি ক'রে তাকেও জানাতে থাক্‌বি।"

"মানুষরা কিন্তু এমনটি করে না।"—মজা ক'রেই বলে ছুট্‌কি। ততক্ষণে সেও কাছে এসে গেছে। "দূর বোকা"—বীরটার জবাব। "ওদের সে পৌরুষ কোথায়? আমিও তো একদিন ঐ পৌরুষের জোরেই দলটাকে দখল ক'রেছিলুম। তখন ঐ বুড়িটা তোর মতন ছুক্‌রি ছিল। ওইতো প্রথম আমাকে লোভ দেখায়, সাহস জোগায়।"

"কিন্তু নিষ্ঠুরতার কথা?"—ছুট্‌কি ফোড়ন কাটে মিটি-মিটি হাসতে হাসতে। "দেখ্, রাগাসনি বলছি"—বীরটা ঝেঁজে ওঠে। "মানুষরা আরও বেশি নিষ্ঠুর, তবে সবই করে কায়দা ক'রে। ওরা বদ্দি ডেকে ছুরি-কাঁচি চালিয়ে পেটের ভেতরের বাচ্ছাকে খুন করে। আবার যারা বেশী শয়তান, তারা 'বড়ি' খাইয়ে বাচ্ছা হবার রাস্তাই বন্ধ রাখে। আর শুনলে অবাক হবি—ওরা আবার ঢাক পিটিয়ে

জাহির করে ওটা নাকি সভ্যতার প্রধান লক্ষণ।" বলেই অহেতুক রাগে ফুলতে থাকে বীরটা। অবুঝের মতই বলে ছুট্‌কি—"তা হ'লে ওরা 'মা' হবে কি ক'রে?"—"আরে, ওরা বেশী 'মা' হতেও চায়না, বেশি বেশি বাবা হতেও চায় না। ওরা সব ঝাড়া-হাত-পা হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে চায়। দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আর আমরা, এই আমার গোটা দলটার কথাই ভাব্‌না—কতগুলো পুষ্যি আমার বল্‌তো? কোনদিন বিরক্ত হয়েছি?" ছুট্‌কি ভাব করতে এগিয়ে আসে—"না, তা হওনি কোনদিন। মিথ্যে বলবো না।" বীরটা সমর্থন চায়—"এই ধর্‌না—তুই যদি এখন একছড়া পাকা কলা জোগাড় করিস্‌—তার বেশির ভাগটাই আমি কেড়ে খেয়ে নেব না? তুই-ই বল্‌না?" ছুট্‌কি মানতে বাধ্য হয় বীরটার দায়িত্বের কথা।

শিশু-বর্ষ

চায়ের জলটা ফুটে ফুটে ম'রে যাচ্ছিল। কল্পনা স্টোভটা নিভিয়ে দিয়ে সোফায় একবার বসলো। একবার উঠে গিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আবার ফিরে এসে সোফায় বসলো। আজ বিকেলেও সে চা খায়নি—ভাল লাগেনি। শরীরটা ক'দিন ধ'রে ভাল যাচ্ছে না। ভেবেছিল, শ্রীবাস্তব ফিরলে একসঙ্গে চা খাবে। আজ ওর কেন যে এত দেরী হ'চ্ছে! সাড়ে ছ'টা পৌনে-সাতটায় রোজই ফেরে শ্রীবাস্তব, আর আজ এখন প্রায় সাড়ে আটটা, ওর দেখা নেই। চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

পাশের ঘরে বাপ্পাকে বইখাতা দিয়ে বসিয়ে এসেছে কল্পনা। পায়ে পায়ে একবার তার কাছে গেল। বাপ্পা ছবির বইয়ের যেখানে রেখা টেনে ছবি আঁকা আছে—রং-পেন্সিল দিয়ে ভরাট করছিল। কল্পনা ওর কাছে গিয়ে বসলো। "ও মা, সূর্যতে রং দাওনি কেন?" প্রশ্ন করে কল্পনা। বাপ্পা ওর মুখের দিকে তাকায়। ব'লে ওঠে—"সূর্য তো সাদা, ওতে আবার রং দেব কি?" কল্পনা হেসে ফেলে বোঝায় তাকে—"সকালে আর বিকেলে সূর্য ওঠার সময় আর ডোবার সময় লাল দেখায়। ছবিতে সূর্য উঠছে দেখাচ্ছে—ওতে লাল রং দিয়ে দাও।" বাপ্পা বলে—"ধেৎ, সে তো পুরীর সূর্য, আর রেলগাড়ীর সূর্য; আমাদের সূর্য তো সাদা।" কল্পনার মেজাজটা এখন ঠিক বাপ্পাকে বিশদ বোঝাবার অনুকূল নয়। তাই চুপ ক'রে যায়। উঠে আর একবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। শ্রীবাস্তবের এখনও দেখা নেই। ঘড়িতে ন'টা বাজলো দেখে, বাপ্পাকে খাইয়ে, বিছানায় শুইয়ে, মশারী টাঙিয়ে দেয়। তারপর আবার সোফায় এসে বসে।

শরীরটা ক'দিন ধরেই খারাপ যাচ্ছে কল্পনার। বলি বলি ক'রেও বলা হয়নি শ্রীবাস্তবকে। আজ যে কেন এত দেরী করছে সে

ফিরতে। পাশের ফ্ল্যাটের অরুণবাবুকে ডেকে বলবে নাকি একটু খবর নিতে। ঠিক এমনি সময় ঘণ্টাটা বেজে উঠলো। কল্পনা উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকলো শ্রীবাস্তব। যেন কত অপরাধ ক'রে ফেলেছে—এমনি ভাব নিয়ে। তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া খুলে রেখে জামার বোতাম খুলতে সুরু করে সে। কল্পনার অভিমান চাগিয়ে ওঠে। "এত দেরী ?" শুধু এই দুটি কথা বলে সে। কৈফিয়তের স্বরেই বলে শ্রীবাস্তব—"আর বোলো না, সরকারী চাকরী—মিনিস্টার, তার সেক্রেটারী, আণ্ডার-সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী—সকলের মন যোগাতেই জীবন মরময়।" "এত দেরী তো তোমার হয়না কোনদিন, আমি ভেবে মরছি"—অনুযোগ করে কল্পনা। "না, কি ব্যাপার জানো, এ বছরটা তো 'শিশু-বর্ষ', তাই মিনিস্টারের হুকুমে সেক্রেটারী হঠাৎ কন্‌ফারেন্স বসালেন চারটের পর—কি ভাবে কি প্রোগ্রাম করা হবে, কে কি দায়িত্ব নেবে, ইত্যাদি। মিটিং আর শেষ হয় না। বাড়ীতে একটা ফোন থাকলে না হয় খবর দিতাম। তাও কি ছাই বুঝেছি—এতটা দেরী হয়ে যাবে। ডেপুটি সেক্রেটারী অবশ্য একটা লিফ্‌ট দিলেন—তা না হ'লে আরও রাত হয়ে যেত ফিরতে।" অনর্গল কৈফিয়ত দিয়ে যায় শ্রীবাস্তব, আর তা উপভোগ করতে থাকে কল্পনা—মনের মেঘ ততক্ষণে তার কেটে গেছে।

তবু অনুযোগের সুরে বলে কল্পনা—"তোমাদের আর কি ? আমি একলাটি থাকি। আগে তবু বাপ্পাকে সামলাতেই দিনটা কেটে যেত। গত সপ্তা থেকে ও স্কুলে যাচ্ছে—আমার আর কাটতে চায়না সময়। সারাটি দিন কি করি বলতো ?" "কেন ? তুমিও তো একটু বেরুতে পার, মানে আশে-পাশে কারো বাড়ীতে একটু আধটু বেড়িয়ে আসতে পার"—বোঝাতে চায় শ্রীবাস্তব। কল্পনার চোখে কৌতুক খেলে যায়—উচ্ছল হ'য়ে উঠে বলে সে—"ক' দিন তো দু'তিনবার ক'রে বাড়ীর বাইরে যেতে হচ্ছে।" পোষাক পাল্টে, সামনের সোফায় বসতে বসতে বলে শ্রীবাস্তব—"কি রকম ?" "তুমি

আর এত রাতে চা খেওনা”—সম্মতি চায় কল্পনা। “না, না, এনাফ্ অফ্ টি টো-ডে। তা, তোমার দু’তিনবার বাইরে যাবার কাহিনীটা ?” প্রসঙ্গে ফিরে আসে শ্রীবাস্তব। কল্পনা ব’লে চলে—“মানে, প্রথম দিন তো বাপ্পাকে—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে এলাম, ফেরার সময়ও দাঁড়িয়ে থেকে নামিয়ে আনলাম। পরের দিন থেকে, মোড়ে মিত্তিরদের বাড়ীর রকে—আর সব ছেলেদের মত—ওকে বসিয়ে রেখে আসছি, আর ফেরার সময় নিয়ে আসছি। এই হ’ল দুবার বাইরে যাবার হিসেব।” “আর তিন বারেরটা ?” মজা ক’রেই জানতে চায় শ্রীবাস্তব। “সেটা রোজ হয়নি. এরই মধ্যে দু’দিন হয়ে গেছে।” “কি রকম ?”—প্রশ্ন করে শ্রীবাস্তব। ‘খাইয়ে দাইয়ে, জামা প্যাণ্ট পরিয়ে, ব্যাগে বই খাতা ভ’রে কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, হাতে টিফিন বাক্স দিয়ে তো বসিয়ে দিয়ে এলাম বাবুকে মিত্তিরদের রকে। খানিক বাদে বাইরে বেরিয়ে দেখতে গেছি—বাস এলো কিনা—দেখি কেউ কোথাও নেই, রকের ওপর কি যেন একটা চক্‌চক্ করছে—কাছে গিয়ে দেখি—তোমার ছেলের টিফিন বাক্স। ওমা, ভুলে ফেলে গেল নাকি ? খুলে দেখি ফাঁকা। বিকেলে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ক’রে জানলাম—বাসের দেরি দেখে ও বাক্স খুলে টিফিনটা খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে শেষ, তাই আর খালি বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে যায়নি। এই ঘটনা ঘটেছে দু’দিন। তাই, আমারও বাইরে যাওয়া ঘটেছে তিনবার ক’রে ঐ দু’দিন।” “সে কি কথা ? ভরা পেটে টিফিন খেয়ে, শেষে সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকা !” উদ্বেগ প্রকাশ করে শ্রীবাস্তব। “হ্যাঁ, এবার ওকে ভাল ক’রে বুঝিয়ে দিয়েছি। তবে, জানিনা—স্কুলে গিয়ে আগেই টিফিন সারে কিনা।”—বলেই হাসতে থাকে কল্পনা।

“নাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো, খেতে দিই। এই ঠাণ্ডায় আর স্নান ক’রো না।” প্রস্তাব করে কল্পনা। “সেই ভাল”—ব’লে, উঠে যায় শ্রীবাস্তব।

খেতে ব'সে সবিস্তারে বর্ণনা করে শ্রীবাস্তব। সারা বিশ্বে এ বছর 'শিশু-বর্ষ' কী-ভাবে পালিত হচ্ছে। ভারতে, বিশেষ ক'রে পশ্চিম বাংলায় কী কী প্রোগ্রাম করা হচ্ছে—সব ফিরিস্তি একের পর এক শুনিয়ে যায় শ্রীবাস্তব। কত লক্ষ টাকার বাজেট "শিশু-বর্ষ" পালনে, তাও বোঝাবার চেষ্টা করে। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে কল্পনা। মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারেনা উদ্যোক্তাদের। তার স্বামীকেও যে 'শিশু-বর্ষ' পালনের দায়িত্বের অনেকটাই বহন করতে হচ্ছে সরকারীভাবে—তা ভেবেও রোমাঞ্চিত হয় ওর শরীর।

শুতে গিয়ে তার শরীর খারাপের খবরটা দিয়ে ফেলে কল্পনা। ক'দিন ধ'রে তার নানা শারীরিক কষ্ট—অরুচি, গা-বমি—ইত্যাদি ; এবং এটা যে সম্ভবতঃ এক নতুন আগন্তুকের আগমন-সঙ্কেত তাও বুঝিয়ে দেয় স্বামীকে, কৃতিত্বের অহমিকার ছোঁয়াচ সমেত। নির্বাক শুনে যায় শ্রীবাস্তব। চুপচাপ। স্ত্রীর উচ্ছ্বাস একটু স্তিমিত হতেই ব'লে ওঠে—"কালই তাহলে ডাঃ বোসের সঙ্গে দেখা করি। কি বল ?" "এত তাড়া কিসের ?" আহ্লাদের সুরে বলে কল্পনা। মুহূর্ত মাত্র দেরী না ক'রে ব'লে ওঠে শ্রীবাস্তব—"সে কি গো ? দেরি হয়ে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। 'রিস্কি' হয়ে দাঁড়াবে। যা করার এখনই ক'রে ফেলতে হবে।"

কল্পনা কি ঘুমিয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যে ? না হলে—কথার জবাব দিল না কেন ? না কি—তার স্বামীর 'শিশু-বর্ষ' পালনের প্রোগ্রামের কথা ভাবছিল ?

ঠিকানা

শীতের দুপুর। দোতলার বারান্দা। দক্ষিণে হেলে পড়া সূর্যের তেজ অনেকটাই অনুপ্রবেশ করেছে। আরামকেদারার বাঁ দিকের বাড়িয়ে দেওয়া হাতলের ওপর একটির ওপরে আর একটি পা তুলে দিয়ে আধ-শোওয়া বিশ্বনাথবাবু কি বিশ্রাম করছেন ? না, সেই ফাঁকে স্মৃতিচারণও ?

সব স্মৃতিই এখন এক হ'য়ে গেছে, একাকার হ'য়ে গেছে একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে। একটি মাত্র আকর্ষণ, একটি মাত্র কল্পনা, তাঁর একটি মাত্র সাধনা, একটি মাত্র মন্ত্র—সেই একমাত্র পুত্র, একমাত্র সন্তান—বৈদ্যনাথকে কেন্দ্র ক'রে।

ছোটবেলাকার সেই অন্ধকারময় দিনগুলোর কথা মনে প'ড়ে যায়। কতদিন হাঁড়িতে জল ফুটে-ফুটে ম'রে গেছে, চাল আর এসে পৌঁছয়নি! এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে আনা বই-খাতা নিয়ে লেখাপড়া শেখা। পরের ছেলের বাতিল করা নতুন নতুন "পুরোনো" জামা-কাপড় প'রে স্কুলে যাওয়া। নিজের চেষ্টায় প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হ'য়ে, বার-বার জলপানি পেয়ে, সম্মানের সঙ্গে এম. এ. পর্যন্ত পাশ করা। একে একে সব ছবির মত মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। তারপর স্কুলে শিক্ষকতা। ধাপে ধাপে উন্নতি করতে করতে,—বি. টি. পাশ করা, সহকারী প্রধান শিক্ষকেব পদ প্রায় বিনা আয়াসেই লাভ করা। তারপর বিবাহ। এই পর্যন্ত সব সোজা; জলের মত যেন গড়িয়ে গিয়েছিল জীবনটা। এরপর হঠাৎই একসঙ্গে একজোড়া সৌভাগ্য, এবং পরক্ষণেই নিদারুণ দুর্ভাগ্য। একই বছরে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ এবং একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথের জন্ম। মাস ছয়েকের বৈদ্যনাথকে রেখে তার মা কমলা যখন হঠাৎ-ই বিদায় নিলেন ইহজগৎ থেকে, পৃথিবীটা যেন স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল

বিশ্বনাথবাবুর কাছে কিছুক্ষণের জন্যে। স্কুলের কাজ, বাইরে ও বাড়ীতে অবৈতনিক শিক্ষকতা, শিশু-পুত্রের পরিচর্যা রক্ষণাবেক্ষণ, সংসার সামলানো—সবই তাঁকে একা দশ-হাতে চালিয়ে যেতে হ'য়েছিল দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

আত্মীয়-বন্ধু-শুভার্থীরা চিরদিনই আছেন, তখনও ছিলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব তাই এসেছিল অসংখ্য। সবগুলোই সহজে কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল শুধু একটি বাদে। স্কুলের সেক্রেটারী মশাই যখন ধ'রে ব'সলেন তাঁর ভগিনীটিকে বিবাহ করার জন্যে, তখন কিছুটা মুস্কিলে প'ড়তে হ'য়েছিল বইকি। সেদিন শুভা নিজেই যদি সাহায্য না করতেন, জীবনের চাকাটা যে অন্যপথে ঘুরত, তা তিনি আজও উপলব্ধি করতে পারেন। অবস্থা যখন চরমে উঠেছিল, মুখের ওপর যখন কিছুতেই 'না' বলা যাচ্ছিল না, তখন কে যেন বুদ্ধি জোগাল আসল মানুষটিরই সাহায্যপ্রার্থী হতে। সব সঙ্কোচ, সংশয় সরিয়ে রেখে তিনি দর্শনে এম.এ.-র ছাত্রী শুভাদেবীকে তাঁর মানসিক অবস্থার কথা অকপটে যখন জানিয়ে ছিলেন, বেশ কিছুক্ষণ নীরবে মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে খুব নীচু গলায় থেমে থেমে শুভা যখন বলেছিলেন—"বেশ, তাই হবে, আমি নিজেই দাদাকে বলব—এ বিয়েতে আমারই আপত্তি আছে", তখন যে কতটা তৃপ্তি পেয়েছিলেন বিশ্বনাথবাবু, কতটা আশ্বস্ত হ'য়েছিলেন,—তা যে আজও মনে প'ড়ে যায়। মাঝে-মাঝেই মনে প'ড়ে যায়।

তারপর নিরবচ্ছিন্ন পুত্র-পরিচর্যা। ছেলেও তেমনি বছর বছর ভালভাবে উত্তীর্ণ হ'তে থাকল প্রতিটি ক্লাসে। একটি দিনের জন্যে ছেলেকে ছেড়ে কোথাও যাননি তিনি, কোন গুরুতর প্রয়োজনেও না—পাছে ছেলের অসুবিধা হয়, পড়ার ক্ষতি হয়। এক একটা বছর কেটেছে যেন এক একটা যুগ। কবে যে ছেলে বড় হ'য়ে উঠবে, পড়াশুনা সাঙ্গ ক'রে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দশজনের একজন হ'য়ে, মানুষের মত মানুষ হ'য়ে উঠবে—সেই প্রতীক্ষা।

মনে পড়ে যায়, ছেলে ডাক্তারি পাশ করার পর যখন বাবার কাছেই থেকে মফঃস্বল শহরেই প্র্যাক্‌টিশ করবার মতলব করছিল, এবং তিনি যখন জোর ক'রে তাকে বিলেত পাঠালেন, তখন ছেলের সে কি আপত্তি! ছোট্ট ছেলেটির মত তো কেঁদেই ফেলেছিল বাবাকে ছেড়ে থাকতে হবে ব'লে। তারপর ছেলের বিলিতি ডিগ্রী নিয়ে ফেরা, বাবার পছন্দ মত পাত্রীটিকে বিবাহ ইত্যাদি। কলকাতায় দু-দুটো বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ পদ, দু'টি খানদানী পাড়ায় দু'বেলায় দু-দুটো 'চেম্বার' সামলানো, পরামর্শদান প্রসঙ্গে প্রায় প্রত্যহই বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, ইত্যাদি ইত্যাদি সেরে, নিত্য, রোজ রাতে এই মফঃস্বল শহরের বাড়িতে বাবার কাছে এসে রাত কাটানো—এসব চলেছে বাঁধা ছকে। পুত্রবধূ পূর্ণিমাও চমৎকার। সেও কিছুতে তাঁকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবে না, বাপের বাড়ীও যাবে না, এ যেন ছেলেরই দেওয়া শিক্ষা, এক ছাঁচে গড়া। দু'জনে যেন বুক দিয়ে আগলে রেখেছে তাঁকে।

মাস দুই আগে স্কুলের কাজে ইস্তফা দিতে হয়েছে তাঁকে, নানা কারণে। বয়েস ও শরীর প্রাথমিক কারণ। দ্বিতীয় কারণ, অবৈতনিক শিক্ষাদানের পথের কণ্টক উৎপাটন। তৃতীয় কারণ, বোধ হয় এটাই মুখ্য—ছেলের একান্ত অনুরোধ। দিন কয়েক হরিদ্বার কিংবা অন্ততঃপক্ষে কাশী গিয়ে থাকলে কেমন হয়—জানতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একমাসের জন্যে 'চেম্বার' ইত্যাদি সব বন্ধের নোটিশ প'ড়ে গেল। ব্যাপারটা কী? না, বাবাকে ছেড়ে এখানে থাকা যাবে না। তাই যেতে হ'লে সকলকেই যেতে হবে। ছেলে বউ একমত। দিল্লীতে ছেলের সেমিনারে লেকচার ট্রাঙ্ককল ক'রে বন্ধ করা হ'ল। কেন? না, বাবাকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না, এবং একদিনের জন্যে তাঁকে নিয়ে গেলেও দারুণ ধকল হবে তাঁর। অতএব যাওয়া বন্ধ।

সকল রকমে চরম সুখ, পরম সার্থকতা, সার্বিক সাফল্যের কথা

মনের মধ্যে যেন একটি মধুচক্র সৃষ্টি ক'রেছিল এই শীতের দুপুরটিতে—মৌমাছির গুণগুণানি যেন কানেই শোনা যাচ্ছিল, এক এক ফেঁাটা মধু যেন ঝরেই পড়ছিল। মনের যখন তাঁর এমনি অবস্থা, ঠিক সেই সময় গৃহভৃত্য মধু একখানা খামশুদ্ধ চিঠি বাড়িয়ে ধ'রে বলল—"পিওন দিয়ে গেল বড়বাবু।" —"কার চিঠি?" ব'লে সাগ্রহে হাত বাড়ালেন বিশ্বনাথবাবু। তৎপর হাতে চশমাটি চোখে লাগিয়ে নিয়ে প'ড়ে ফেললেন খামের ওপর লেখা ঠিকানাটা। হ্যাঁ, তাঁরই চিঠি—

Sree Biswanath Mitra,
C/o. Dr. B. N. Mitra,
M.B.B.S (Cal), M.R.C.P. (Lond.),
— ইত্যাদি।

খামশুদ্ধ হাতটা ধীরে ধীরে নেমে এল আরাম কেদারার হাতলটির ওপর। খামটা না খুলে কার চিঠি না দেখেই রেখে দিয়ে, চোখ বুজে শুয়ে থাকলেন বিশ্বনাথবাবু অনেকক্ষণ ধ'রে।

তাঁর সার্থক সাধনার কথা, তাঁর পরিতৃপ্ত জীবনের কথা, আবার পর পর মনে পড়তে থাকল—চোখের সামনে ভাসতে থাকল জীবন্ত ছবির মতো। সেই সঙ্গে সেই সব পরিচ্ছন্ন ছবিগুলোর ওপর দিয়ে কেবলই যেন একটা হালকা মেঘের মত ভেসে বেড়াতে থাকল—মস্ত বড় একটা 'কেয়ার অফ'-জোড়া তাঁর নিজের ঠিকানাটা।

উদ্বোধন

১৯৫০ সাল। মফঃস্বল শহর। তখনকার দিনে ‘গ্রামরক্ষী-দল’ গ’ড়ে নিজ নিজ এলাকায় পাহারা দিয়ে সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে সাহায্য করার রেওয়াজ চালু ছিল। আমাদের পাড়ার ছেলেরাও বারে বারে প্রয়াস পেয়েছে—‘গ্রামরক্ষী-দল’ গঠনের। দল গঠিত হ’য়েছে ঠিকই, তবে বেশীদিন কোনও বারই বেঁচে থাকেনি—উৎসাহীদের হঠাৎ হঠাৎ অনুৎসাহের কল্যাণে।

কিভাবে যেন এবারের দলটি অনেকদিন ধ’রেই পাহারা দিয়ে চলেছে—সারারাত ধ’রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে—চোর তাড়িয়ে! সমিতির উদ্দেশ্য—এলাকার কারও বাড়ীতে চুরি না হয়, চোর এলে তাড়া খেয়ে যেন পালিয়ে যায়। আর যদি নেহাতই ভালোমানুষের মতো এসে ধরা দিয়ে ফ্যালে দলের কাছে—তাকে মানে-মানে থানায় জমা ক’রে কর্তব্যের সমাপ্তি। আসলে কিন্তু প্রতিটি সদস্যই মনে মনে কামনা করে—চোর না আসুক—তা নয়। চোর আসুক, আমার হাতে ধরা পড়ুক, তাকে সকলে মিলে বেদম প্রহার করা হোক, আর শেষে ভোর-রাতে সকলে মিলে আধ-মরা চোরটাকে থানায় জমা ক’রে আসা হোক। এই থানায় জমা করার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য প্রচুর। কারো কারো মতে চোরকে হাত-পা ভেঙে ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, জমা করার সময় পুলিশ বিরক্ত হ’য়ে জমাকারীদের ওপরই তম্বি করে বেশী। আর ভাগ্যগুণে যদি চোরটিকে ‘চালান’ করা হয়, তাহলে ইস্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যবসা ইত্যাদি কামাই ক’রে দিনের পর দিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজিরা দেওয়া খুব সুখের ব্যাপার নয়। তখন যেন মনে হয়—চোরটা যেন আমাদের ঐ হয়রানিতে মনে মনে মজা পাচ্ছে।

যাই হোক, এবারের গ্রামরক্ষী-দল চালু আছে অনেকদিন

ধ'রে—তা প্রায় দু'বছরতো হবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সবকটা ঋতুই পার করেছে এবারের উৎসাহী সদস্যরা। আমিও নাকি এ দলের একজন এক নম্বরের উৎসাহী সদস্য—মহল্লার বয়স্করা অন্ততঃ তাই মনে করেন। কিন্তু যে কথা লিখতে বসেছি—সে অন্য কথা।

একদিন রাত শেষ হয় হয়। রাতের পাহারা শেষ ক'রে সবে ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ ক'রে বিছানা নিয়েছি। বৈশাখ মাস—পূর্ণিমার প্রতিবেশী কোন তিথি। শেষ রাতেও চাঁদের আলো নিঃশেষ হয়নি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু কেন যেন ঘুমিয়ে পড়ছিনা। বোধহয় অবসাদ মাত্রা ছাড়ালে সহজে ঘুমিয়ে পডার শক্তিও থাকে না।

বিছানায় শুয়ে আছি—প্রায় 'আধ-জাগা' অবস্থায়। হঠাৎ মাথার দিকে জানলায় একটা মৃদু শব্দ। ভাবলুম—বেড়াল! কারণ, প্রায়ই রাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি বেড়াল আমার মাথার দিকের জানলা দিয়ে ঢুকে বিছানার পাশে তক্তপোষের বাড়তি কাঠটুকুর ওপর দিয়ে গুটি-গুটি হেঁটে—পায়ের দিকের জানলা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতো—পথ শর্টকার্ট করতে। মনে প'ড়ে গেল—একদিন দুর্বুদ্ধিবশে—ওটা যখন ঠিক আমার পা-বরাবর এগিয়েছে -মশারীর মধ্যে থেকে একটা লাথি হাঁকড়েছিলুম তাকে। 'কোঁক' ক'রে আওয়াজ ক'রে ছিট্‌কে পড়েছিল সে ঘরের মেঝেতে। তারপর পালিয়েছিল। সেদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল কি কারণে বুঝিনি কিন্তু মাথাটা ভিজে ভিজে লেগেছিল, মাথার কাছে মশারীটাও ভিজে, দুর্গন্ধ। সেই থেকে ওকে আর ঘাঁটাইনি।

এদিনও তাই মাথার দিকের মৃদু শব্দটিকে বেড়ালটির আগমন বার্তা ভেবে নিশ্চিন্ত হ'লুম। একটু পরেই আবার একটু শব্দ। এবার দেখতে হ'ল। নিঃশব্দে মাথা ঘুরিয়ে জানলার দিকে চেয়ে দেখতেই—শরীর হিম হ'য়ে যাবার দাখিল। বাইরে চাঁদের আলো। মশারীর মধ্যে থেকে স্পষ্ট দেখলুম একটা জোয়ান লোক জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে জানলার গরাদ কাটার চেষ্টা করছে—কি

একটা যন্ত্র দিয়ে। আমাদের অতি সাবেক কালের পুরোন বাড়ী। আমার ঘরটি আবার বাড়ীর একেবারে শেষ প্রান্তে, বাগানের দিকে। ঘরের জানলার গরাদগুলো কাঠের—জরাজীর্ণ অবস্থা! একটা সাধারণ ছুরি দিয়েও কয়েক মিনিটেই ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা ক'রে ফেলা—সহজ ব্যাপার।

লোকটিকে দেখেই 'চোর' ব'লে ভেবে নেওয়া ছাড়া অন্য কথা মনে আসে নি। চোরটি জানলার ওপরের অংশের একটি গরাদে কি যেন ঘস্‌ছে। বুঝতে বাকি রইলো না মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে ঘরে ঢুকে পড়বে। 'সাহসী' ব'লে—দলের মধ্যে আমার সুনাম অনেকদিনের, 'দুঃসাহসী' ব'লে দুর্নাম—গুরুজনদের কাছে।

চোরটা নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে, আর আমি শুয়ে শুয়ে দ্রুত ভেবে চলেছি—কী করা যায়! শুয়ে শুয়ে—'চোর' 'চোর' ব'লে চীৎকার করলে এতদূর থেকে বাড়ীর কারও শুনতে পাবার কথা নয়। তবে ভরসা এই—এখনও আমাদের ডিফেন্স পার্টির অফিস ঘরে বোধহয় দু'চারজন থেকে গেছে ভোর হবার অপেক্ষায়—যাদের ভোরের দিকেই কাজে বেরুতে হবে। চেঁচিয়ে ডাকলে তাদের সাড়া পাওয়া বিচিত্র নয়। তবু ভাবছি—কি করা যায়! 'চোর' ধরবার সখ ওদের কারোর চেয়ে আমার কম নয়। ভীতু আমি নই ঠিকই—কিন্তু দৈহিক শক্তি নেহাতই পল্‌কা—বিশেষ ক'রে চোরটার যা দশাসই চেহারা, দেখেই মনে আতঙ্ক জাগে।

আমি যতই দ্রুত ভেবে চলেছি কি করা যায়, চোরটা ততই দ্রুত চাকু চালিয়ে চলেছে কাঠের গরাদের ওপর। শব্দ শুনে বেশ বুঝতে পারছি—করাত্‌ নয়, ছুরি জাতীয় কিছু দিয়ে পেন্সিল কাটার মতো ক'রে নরম কাঠের গরাদ কেটে চলেছে সে—চোক্‌লা চোক্‌লা ক'রে। আর বেশী দেরী নেই, ভাবতে ভাবতেই—'মড়াক' ক'রে শব্দ। একটা গরাদ চোরটার হাতে চ'লে গেল। চোরটা তার কালো মাথাটা একবার গলিয়ে দেখে নিল ভেতরে ঢুকছে কিনা। তার পরই সে পাশের গরাদটিও কাটতে শুরু করলো।

বোঝা গেল—নিজের বপুর আয়তন সম্বন্ধে সে খুবই সচেতন। আর একটা গরাদ কাটার কাজ চলতে থাকলো।

উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে, আর চোরটির কার্যকলাপ দেখতে দেখতে কেমন ক'রে যেন মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। তখন কেবলই ভাবছি—পালাতে দেওয়া চলবে না, যেভাবেই হোক ধ'রতে হবে চোরটাকে।

ঘরের কোণে সাবেককালের একটা উঁচু টুল ছিল, যার ওপরে এই সেদিন পর্যন্তও মস্ত একটা পেতলের ফ্লাওয়ার ভাস্ রাখা ছিল। টুলটা বেশ উঁচু আর ছিম্ছাম্ গঠনের। সন্তর্পণে ঘরের মেঝের দিকের মশারীটি একটু উঁচু ক'রে—নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামলুম। নিঃশব্দেই ঘরের কোণ থেকে সেই টুলটা নিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে বসালুম। চোরটা তখনও দ্বিতীয় গরাদটি কেটে চলেছে। দেয়াল-ধারের আল্না থেকে একখানা ধুতি টেনে নিয়ে—সেটাকে লম্বা ক'রে গুছিয়ে নিলুম হাতে—ঠিক দড়ির মতো ক'রে। ধীরে ধীরে কাপড়ের দড়ি হাতে নিয়ে টুলটির ওপর উঠে দাঁড়ালুম, চোরটার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে চোরটা দ্বিতীয় গরাদটি কেটে নিয়ে বাইরের দিকে মাটিতে রেখে দিয়ে প্রথমে জানলা দিয়ে মাথাটি গলিয়ে দিল। বোধহয় সুবিধে হ'ল না। মাথাটি বার ক'রে নিয়ে প্রথমে একটি পা জানলা টপ্‌কে ঘরের মধ্যে রাখলো। তারপর মাথাটিও গলাল, অবশেষে অপর পা-টি। এইভাবে সারা দেহটি তার এখন ঘরের মধ্যে। টুলের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখছি, বুকের মধ্যে কিন্তু হাতুড়ি পিট্‌ছে। চোরটা মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে চোখ-দুটো মশারীতে ঠেকাল, ভেতরে কে এবং কিভাবে শুয়ে আছে দেখবার মতলবে। কি দেখলো বা কিছু দেখতে পেলো কিনা বুঝলুম না। চোরটা সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরতে যাবে, আমি আমার কাজ শুরু ক'রে দিলুম। হাতে পাকিয়ে নেওয়া কাপড়ের দড়িটির একপ্রান্ত ধ'রে সিলিং ফ্যানের রডের সঙ্গে

জড়াবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। তাতে যা সামান্য শব্দ হ'ল—তাইতেই চোরটা সচেতন হ'য়ে উঠলো। আমার দিকে তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখবার, ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা ক'রতে থাকলো, কোনরকম শব্দ করলো না। আমি তখন 'আপ্রাণ' চেষ্টা ক'রে চলেছি—সিলিং ফ্যানের সঙ্গে হাতের দড়িটি বেঁধে দেবার। নাগাল পাচ্ছি না। যতটা সম্ভব উঁচু হ'বার চেষ্টা অবশ্য করছিলুম না; টুলটি টলমল ক'রছিল। তবু চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। হঠাৎ চোরটা চাপা গলায় ব'লে উঠলো, "এ্যাই! কী হচ্ছে?" আমি যেন শুনতেই পাইনি এমনি ভাব দেখিয়ে আক্ষেপ আর সংকল্প মেশানো স্বরে চাপা গলায় বলতে লাগলুম,—"এ জীবন আমি আর রাখবো না।" চোরটা আবার বলল চাপা গলায়—"কি হচ্ছে কী?" আমি শুনতেই পেলুম না। তবু বলতে লাগলুম বিড়বিড় ক'রে,—"এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব—আত্মহত্যাই আমার একমাত্র রাস্তা।" চোরটা মনে হ'ল এবার একটু কাছে এগিয়ে এল। আমার বাঁ পায়ের হাঁটুতে আল্‌তো ক'রে হাত ঠেকিয়ে চাপা গলায় বলল—"কি হচ্ছে কি? নাবো বলছি।" এবার আমি প্রায় চীৎকার ক'রেই বল্লুম,—"ছেড়ে দাও আমাকে, আত্মহত্যা আমি করবই।" চোরটা এবার আরও ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। আমার হাঁটুর কাছটা জাপটে ধ'রে আমাকে টুল থেকে নামাতে চাইলো। আমি এবার হাত-পা ছুঁড়ে দারুণ জোরে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলুম—"ছেড়ে দাও আমাকে, এ জীবন আমি আর রাখবো না। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।" চোরটা—এবার মনে হ'ল—খুবই বিব্রত বোধ করছে। সে একহাতে আমার হাতের কাপড়ের দড়িটা ধ'রে ফেলেছে, আর একহাতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগলো,—"আত্মহত্যা করা মহা পাপ! শীগ্‌গির নাবো বলছি। আমি লোক ডাকবো।" আমি তখন আরো জোরে চীৎকার শুরু করেছি—"ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও বলছি।"

আমার চীৎকারে বাড়ীর সামনের দিকের ঘরগুলো থেকে বাবা, ছোটভাই, বোনেরা, আর ওপর ঘর থেকে দাদা ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি তখনও সমানে চেঁচিয়ে চলেছি। "ছেড়ে দাও আমাকে, এ-জীবন আমি আর রাখবো না!" বাইরে থেকে দাদার গলা পাওয়া গেল—"কি হ'ল রে? হ'লটা কি? দরজা খোল্!"—দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগলো। চোরটা চট্ ক'রে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর ভেতরের দিকের দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিল। দাদা, বাবা, ভাই সকলে হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকলো। আমি তখনও টুলের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে চলেছি—"এ জীবন আমি আর রাখবো না······" ইত্যাদি। দাদা কাছে এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন ভাবেই প্রশ্ন করলো—"ব্যাপারটা কী? নাব্ টুল থেকে, হয়েছে-টা কী?" আমি তখনও সমানে চীৎকার ক'রে চলেছি। দাদা, ছোটভাই দু'জনে আমাকে ধ'রে টুল থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। আমি অতি কষ্টে বললুম— "একটু জল।" ঘরের কোণে কুঁজোয় জল রাখা ছিল—ওপরে গ্লাস চাপা। দাদা সেদিকে তাকালো। চোরটা চট্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে এগিয়ে ধরলো। আমি হাতটা বাড়াতে যাচ্ছি—দাদা হঠাৎ ব'লে উঠল—আশ্চর্য হ'য়ে চোরটার দিকে তাকিয়ে—"তুমি কে ভাই?" চোরটা থেমে গেল। আমার মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না উত্তেজনায়। অতি কষ্টে বললুম চোরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে—'দাদা······চোর!!" চোরটা হতভম্ব। পালাবার পথ নেই, পালাবার কথা বোধহয় ভাবতেও পারছে না। ভাবটা—"সত্যিই তো,—আমি কে?"

ততক্ষণে সকাল হ'য়ে গেছে। আমি ছোট বোনকে বল্লুম— "তাড়াতাড়ি চা কর্।" চোরটাকে আমার বিছানায় বসতে বল্লুম। সে দাঁড়িয়েই রইলো। বাড়ীর সকলে অবাক। চোরটাকে প্রায় জোর ক'রে বসালুম, সে আপত্তি করলো না। ঘটনাটা সংক্ষেপে বললুম সকলকে। শুনেই, দাদা ছোট ভাইকে থানায় খবর দিতে

বলল। বাবা বললেন—"না।" আমিও বল্লুম—'থানায় দেবার জন্যে তো ধরিনি ওকে।" চোরটার চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রতে লাগলো। ইতিমধ্যে চা এসে গেল।

* * * *

১৯১২ সালের মার্চ মাস। আমার অফিসের তিনতলার ঘরে একলা ব'সে কাজ করছি। হঠাৎ কানে এল—"আসতে পারি ?" মুখ তুলে তাকালুম, দেখি এক ভদ্রলোক—দোহারা মাজা চেহারা, পরিপাটি পোষাক—প্যান্ট-সার্ট, নেকটাই—দরজার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে—ইসারায় চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলুম। তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে ব'সে, খুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—"চিনতে পারেন ?" চিনতে পারলুম না, তা জানালুম। ভদ্রলোক বললেন—"না পারারই কথা। বার বছর আগে আপনি আমায় পুনর্জন্ম দেন। সেই দিন থেকেই 'অন্য' মানুষ আমি। কাঠের ব্যবসা করি। শিলিগুড়িতে কাঠের আড়ৎ আছে আমার, কলকাতায় ফার্ণিচারের দোকান। বর্ত্তমানে আমার কর্মচারী সংখ্যা শ'দেড়েকের মত।"

তারপর তিনি যা যা বললেন, তাতে আমার বছর বার আগেকার —ভুলে যাওয়া ঘটনাটা নতুন ক'রে মনে প'ড়ে গেল।

বিদায় নেবায় সময় বললেন—আমাদের গ্রামে—পাণ্ডুয়ার কাছে —ছোটদের একটা অবৈতনিক স্কুল খুলছি, আগামী শনিবার উদ্বোধন। আপনাকে দয়া ক'রে—স্কুলটিরও উদ্বোধনের দায়িত্ব নিতে হবে। ঠিক সকাল আটটায় বাড়ীতে গাড়ী পাঠিয়ে দেব। যোগ করলেন—বাড়ীতো আমার চেনাই—মুখে তাঁর এক টুকরো করুণ হাসি।

কৈলাস

"হাতটা একটু দেখুন না প্রভু"—ভয়ে ভয়ে বলে অলকেশ। ডান হাতটা সামান্য একটু বাড়িয়েও ধরে। "কী জান্‌তে চাস্‌ বেটা ?" —জলদ্‌ গম্ভীর প্রশ্ন। "মানে, এই ফরেন, মানে বিদেশে যাওয়া-টাওয়া আছে কি না ?" —সসংকোচে জ্ঞাপন করে অলকেশ। প্রভু যেন হাসলেন, নিঃশব্দে, চোখ দু'টি বন্ধ, লম্বা পাকা দাড়িটি শুধু কাঁপতে থাকলো। একটু অপ্রস্তুতই বোধ করে অলকেশ।

তার বাড়িয়ে ধরা হাতের দিকে না তাকিয়েই—শুধু কপালের দিকে এক-ঝলক তাকিয়ে নিয়ে—ফরমান্‌ দেন প্রভু—"বিদেশ কী বল্‌ছিস্‌ বেটা, তোকে তো এই গ্রহই ছেড়ে চ'লে যেতে হবে।" শুনেই আঁতকে ওঠে অলকেশ। "কবে ? কবে প্রভু ?" "দেরি আছে। তা এখনও বিশ-বাইশ বছর!" মাত্র ? তার মানে—বাইশ দু'গুণে চুয়াল্লিশ বছর মাত্র তার পরমায়ু! প্রভু যেন মনের কথা বুঝতে পেরেই বললেন—"পরমায়ু তোর এই পৃথিবীর হিসেবে দেড়শো বছর।" আবার আঁতকে ওঠার পালা অলকেশের। এবার একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে প্রভুর শ্রীচরণে—"একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন প্রভু। কিছুই যে বুঝতে পারছি না।"

প্রভু চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে বসে থাকেন কিছুক্ষণ, তা প্রায় পাঁচ মিনিট। আর অলকেশ ব'সে ব'সে ঘামতে থাকে অনর্গল। হঠাৎ চোখ খোলেন প্রভু—"সন্‌ চোদ্দশো সাত সালের পয়লা ভাদ্র ভারতীয় সময় দ্বি-প্রহর অন্তে"—বলেই চুপ করেন প্রভু। চোখ দু'টি আবার বন্ধ হ'য়ে যায়। যেন ফাঁসির হুকুম শুনছে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে—এমনি মনে হয় অলকেশের। মনে মনে হিসেব ক'রতে থাকে তারিখটার। বার বার ভুল হয় হিসেবে। আবার শুরু করে। অবশেষে, অবশেষে নিজের মনেই

'রায়টি' জানতে পারে সে—দু'হাজার খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৮।১৯ তারিখ নাগাদ পরমায়ু তার শেষ। এখন ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ, তা'হলে তো সেই বাইশ বছরই হচ্ছে হিসেবে। কিন্তু ঐ যে আবার বলেছেন— 'দেড়শো বছর পরমায়ু'—সেটা তো মিলছে না। ব্যাপারটা কি ? এবারে একেবারে প্রভুর পায়ের ওপর প'ড়তে যাচ্ছিল—আর এগোতে হ'ল না। আবার চোখ খুললেন প্রভু। কণ্ঠস্বর যেন কোন্ এক অন্য জগৎ থেকে ভেসে আসছে—অথচ জলদ-গম্ভীর, শান্ত সমাহিত—"দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় আবাস কৈলাসের শীর্ষবিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় পাঁচশত ক্রোশ পরিমাণ ব্যাসার্ধ নিয়ে চতুর্দিকের সমুদয় ভূভাগ পৃথিবী গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে পৃথক একটি গ্রহের সৃষ্টি করবে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কর্মফল, কর্মকাণ্ড যদি ইতিমধ্যেই হিতাহিত সমন্বয়ে প্রয়াসী হয় তা'হলে অন্য গ্রহের সৃষ্টি না হ'য়ে সেই বিচ্ছিন্ন ভূভাগ পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ হ'য়ে পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণমান হ'য়ে থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ, বর্তমানের জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক ঋষিরা অচিরেই বিষয়টি উপলব্ধি ক'রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" "আমার—আমার কী হবে প্রভু ?" "তোকে ঐ বিচ্ছিন্ন অংশের অধিবাসী হ'য়ে পৃথিবী ত্যাগ ক'রতে হবে, এবং তথাকার সামান্য কয়েকটি জীবিত প্রাণীর মধ্যে তুই হ'বি অন্যতম।"

আতঙ্কে কুঁকড়ে থাকে অলকেশ। যদিও এখনও সুদীর্ঘ বাইশ বছরের ব্যবধান—তবু চিন্তায় প'ড়ে যায় সে। মিন্‌মিন্ ক'রে বলে —"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু। যদি এতই করুণা ক'রে থাকেন আমাকে একটু খুলেই বলুন না ব্যাপারটা।" প্রভু যেন এবারে ধরাধামে অবতীর্ণ হন—সহজ সরল স্বরে বলেন— "ব্যাপারটা কি জানিস—যে ভূভাগটার কথা বল্‌লাম—পৃথিবীর ঠিক সেই অংশটির ঘনত্ব সব থেকে বেশি। বর্তমানে, বিশেষতঃ বিশাল হিমালয় সমেত বিরাট স্থলভাগ, তার উপর জনসংখ্যা, সব মিলিয়ে আপেক্ষিক গুরুত্ব এখানকার সব থেকে বেশি। আগামী বিশ-বাইশ

বছরে হাজার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই ভূভাগটুকুর জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় পাঁচশ' কোটিতে। জনসংখ্যার চাপে উদ্ভিদ বা অন্য কোন জীব প্রায় লুপ্ত হ'য়ে যাবে। আহারের উপাদান পরিবর্তন ক'রেও নিস্তার পাওয়া যাবে না। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাই পৃথিবীর আবর্তনের সাথে সাথে এই অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি ভারি অংশটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে বাধ্য হবে, এবং বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তো কোথাও যাবার যো নেই কারো, তাই তৎকালীন ওজন অনুসারে হয় সেটি অন্য একটি গ্রহে পরিণত হ'য়ে পৃথিবীর মত সূর্যকে পাক খেতে থাকবে, না হয় চাঁদের মত অন্য একটি উপগ্রহে পরিণত হ'য়ে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করতে থাকবে। এ হ'তে বাধ্য।" "কিন্তু, সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে তো ?"—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে অলকেশ। "থাকবে, যদিও কিছুটা অন্য ভাবে। কারণ, উপাদান যে জীবনের অনুকূলেই থেকে যাচ্ছে।"

কি যেন ভাবতে থাকে অলকেশ। তারপর হঠাৎ যেন ধ্যান-ভঙ্গ হ'য়েই বলে—"কিন্তু সেই বিরাট কর্মকাণ্ডে বিরাট বিস্ফোরণ সত্ত্বেও আমি—আমি কিভাবে জীবন্ত সেখানে পৌঁছব প্রভু ? সেটা তো বোঝা গেল না ?" মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন প্রভু। বলেন—"তুই একটু ভেবে দেখলে নিজেই বুঝতে পারতিস্। তবু বলি, সেই সময় হিমালয়ের একটি অধিত্যকায় উপযুক্ত পরিবেশে পরীক্ষামূলকভাবে বিশাল একটি মহাকাশযান প্রস্তুত হ'তে থাকবে মহাকাশ যাত্রার জন্য। তা'তে থাকবে নমুনা হিসাবে কয়েক রকমের জীবন্ত প্রাণী, হরেক রকমের উদ্ভিদ সমেত কয়েকটি প্রাণবন্ত মানুষ—নারী ও পুরুষ। তুই থাকবি তাতে প্রশিক্ষণ বিভাগের অধিনায়ক হিসাবে—যাত্রার জন্য উপযুক্ত পোষাকাদি এবং ব্যবস্থাদি সমেত প্রস্তুত হয়েই, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটবে সেই নৈসর্গিক বিস্ফোরণ—উৎক্ষেপ—বিচ্ছিন্নতার কর্মকাণ্ড। আর, সেই সঙ্গে সেই বিশাল মহাকাশযানটি তার সকল অধিবাসী সমেত চ'লে যাবে সেই স্বতন্ত্র গ্রহ বা উপগ্রহে।"

বিহ্বল অলকেশ কোন রকমে প্রশ্ন করে—"তারপর ?" "তারপর তোরা সেখানে নূতন জগৎ সৃষ্টি করবি। তোর উত্তরপুরুষেরা এক সুসভ্য মানব জাতিতে পরিণত হবে—জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত। পুরাতন পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ লাভ করবে তোদের নূতন পৃথিবীতে।" একটু যেন উৎসাহিত হ'য়েই প্রশ্ন করে অলকেশ—"নূতন পৃথিবীর কী নাম হবে প্রভু ?" "কৈলাস-কেন্দ্রিক সে জগতের নামও হবে—'কৈলাস'। তোরা সর্ব-সমেত আশি জন স্ত্রী-পুরুষ—প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক—সেখানে গিয়ে যে নূতন জগৎ সৃষ্টি করবি—একশ' বছরে সেখানকার অধিবাসী সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক হাজারের মত। প্রত্যেকেই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত। তোদের ছোটখাট—এমনকি গৃহস্থালীর কাজ সবই করবে যন্ত্র-মানবে। তোরা শুধু আধুনিক শাস্ত্র-চর্চা এবং আধুনিকতম যন্ত্র-সৃষ্টির কাজেই ব্যাপৃত থাকবি। 'কৈলাস' তখন সত্যই এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।"

কি যেন চিন্তা করে অলকেশ। মনের কথা বুঝে নিয়েই যেন ব'লে চলেন প্রভু—"এই পৃথিবীর চেহারাও তখন পাল্টে যাবে। ঐ বিশাল ভূভাগটি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবার ফলে, পৃথিবীর আবর্তনে, শূন্য স্থান পূরণের তাগিদে এশিয়া আর আমেরিকা জোড়া লেগে যাবে। তখন মহাদেশ থাকবে মাত্র চারটি—এসিয়া-আমেরিকার মিলনে—'আসিরিকা', ইউরোপ-গ্রীনল্যাণ্ড ইত্যাদি সব একত্রিত হ'য়ে গিয়ে—'ইউরিকা', এদিকে 'আফ্রিকা' তো আছেই, আর অস্ট্রেলিয়া এবং য়্যাণ্টার্টিকা মিলে গিয়ে হবে—'অস্ট্রেলিকা'। এ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।" "কিন্তু, ঈশ্বরের হঠাৎ এমন অদ্ভুত ইচ্ছা হবার কারণ কী প্রভু ?"—দুর্বিনীত প্রশ্ন করে অলকেশ। "মৃদু হেসে স্নেহের সঙ্গেই বলেন প্রভু—"ঠিক তোর উপযুক্ত প্রশ্নই করেছিস্ বেটা। দেখ্, ঈশ্বর তাঁর এই প্রিয় সন্তান মানবজাতিকে খুবই ভালবাসেন। এই যে আজ পৃথিবীতে—দেশে-দেশে, মহাদেশে-মহাদেশে, জাতিতে-জাতিতে

এত ভেদাভেদ, এত দলাদলি, এত হানাহানি—এ সব বন্ধ না হ'লে সমগ্র মানব জাতিরই ধ্বংস হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। ঈশ্বর তাই মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ক'রে তুলে দীর্ঘ দিন আগেই তাঁর এই নব পরিকল্পনার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছেন।" "কিন্তু, হানাহানি বন্ধ হবে কিভাবে?" "তাও বুঝলি না? —মানুষ তখন শক্তিতে উন্মাদ হ'য়ে উঠে—জনসংখ্যার চাপেও বটে—তোদের নূতন পৃথিবী কৈলাসে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাও চালিয়ে যাবে দীর্ঘদিন ধ'রে। ওদিকে তোরা বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে এমন ব্যবস্থা ক'রে রাখবি যে তারা তোদের ধারে-কাছেও ঘেঁসতে পারবে না। পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতি তখন ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হ'য়ে উঠে সম্মিলিত-ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে আরও উন্নত হ'য়ে উঠতে। তখন প্রবল প্রতিপক্ষ 'কৈলাস'-বাসীরাই হবে তাদের একমাত্র এবং প্রবলতম শত্রু। প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মানসিকতাই তাদের নিজেদের মধ্যের ঘরোয়া বৈরীভাবকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দেবে। কঠিন কোন ব্যাধি হ'লে মানুষ যেমন ছোট-খাট রোগের কষ্টের কথা ভুলে যায়,—বা ছোটখাট ব্যাধি হয়তো সেরেই যায়, তেমনই সারা পৃথিবীর মানুষ তখন সব 'ভাই-ভাই' হ'য়ে উঠে সংগ্রাম চালাবে প্রবল শত্রু কৈলাসবাসীদের বিরুদ্ধে।" যেন নিজেরই একটা সমস্যা—এমনি সুরে প্রশ্ন করে অলকেশ—"তাহলে এই হাজার কোটি মানুষের বিরুদ্ধে কৈলাসের মাত্র এক হাজার লোক—পেরে উঠবে কি ক'রে প্রভু?" "পেরে উঠবে বৎস। পেরে উঠবে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রতাপে। আর 'হাজার কোটি' পাচ্ছিস্ কোথা? 'কৈলাস' বিচ্ছিন্ন হবার সময়েই তো বিচ্ছিন্ন অংশের প্রায় পাঁচশ' কোটি শেষ, আর সেই বিস্ফোরণের কারণেই অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রায় দু'শ কোটি খতম। তারপর পৃথিবীর আবর্তনে যে ভাঙা-গড়া চলবে তাতেও অন্ততঃ আরও একশ' কোটিকে জীবনদান করতে হবে। তাহলে আর

থাকলোটা কত ? তুই তো বৈজ্ঞানিক আর অংকশাস্ত্রে বিশারদ. হিসেব ক'রেই দেখনা।" যেন একটু আশ্বস্ত হয় অলকেশ। যেন কৈফিয়তের সুরেই বলেন প্রভু—"ধরাধামে শান্তি, মৈত্রী, সাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এছাড়া সহজ উপায় বোধহয় আর ছিল না—সেই সাথে জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের।"

নিজেই যেন এক সমস্যায় পড়েছে—এই সুরে প্রশ্ন করে অলকেশ—"তখন বিজ্ঞান চর্চ্চার, বিশেষ ক'রে মহাকাশ গবেষণার প্রধান কেন্দ্র পৃথিবীর কোন্ অংশে থাকবে প্রভু ? আমেরিকায় না রাশিয়ায় ?" আবার মৃদু হাসেন প্রভু—"অত সহজ হবে না তোদের পক্ষে। 'আসিরিকা', 'ইউরিকা' বা 'আফ্রিকা' কোথাও নয় বেটা, —প্রধান কেন্দ্র তখন স্থাপিত হবে 'অস্ট্রেলিকাতে।' "কেন প্রভু ? ওদেশ তো এখনও বিজ্ঞানে ততটা উন্নত হ'য়ে ওঠেনি।" "প্রাণের দায়ে বৎস, প্রাণের দায়ে। পৃথিবী আর কৈলাসের পরিক্রমার মধ্যে কোন সময়েই কৈলাস থেকে অস্ট্রেলিকাকে দেখা যাবে না। তখনকার আধুনিকতম দূরবীক্ষণ দিয়েও নয়। কারণ পৃথিবীর ঐ অংশটি চিরকালই কৈলাসের নজরের আড়ালেই থেকে যাবে। ঠিক সেই কারণেই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রধান ঘাঁটিটি-কে অস্ট্রেলিকাতে স্থানান্তরিত ক'রবে—ক'রতে বাধ্য হবে। তাছাড়া তখন তো পৃথিবীতে 'এদেশ' 'ওদেশ' ভেদাভেদ জ্ঞান থাকবে না।"

গোটা ব্যাপারটা একবার কল্পনায় দেখে নিতে ইচ্ছে হয় অলকেশের। মনের কথা বুঝে নিয়ে প্রভু বলেন—"চোখ বুজে একাগ্র-চিত্তে আমি যেমন যেমন ব'লে গেলাম কল্পনা করার চেষ্টা কর। তুই নিজেই উপলব্ধি ক'রতে পারবি।" অলকেশ চোখ দু'টি বুজে ভাববার চেষ্টা করে। কতক্ষণ কেটে যায় তার হদিশ পায় না। হঠাৎ মনে হয় প্রভু যেন হালকা ক'রে হাত রাখলেন তার কাঁধে। অলকেশ চোখ খোলে,—খুলেই সামনে দেখতে পায় অপরূপা এক সুন্দরী তরুণীকে। অপরূপ তার সাজ-সজ্জা—ঠোঁটের

কোণে সম্মোহনী হাসি। সে কি তবে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গেছে? ভাবতে চেষ্টা করে অলকেশ। আশপাশের পরিবেশের দিকে তাকায় সে। কোথায় সেই হিমালয়ের নিভৃত গিরিকন্দর? কোথায় বা সেই জটা-জুটধারী পক্ককেশ দীর্ঘ-শ্মশ্রু ঋষিতুল্য সন্ন্যাসী? অবাক বিস্ময়ে তাকায় সে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা স্বর্গের অপ্সরার মুখের দিকে। অপ্সরাটির ঠোঁটের কোণে মৃদু সহানুভূতির হাসি, চোখে অপাঙ্গ চাউনি। বীণানিন্দিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে—"আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়ে গেছে·········" একি? এ-যে পরিষ্কার ইংরিজীতে কথা বলছে! আবার চারিপাশে তাকায় অলকেশ। একে একে সবই মনে পড়তে থাকে তার।

দেশের সেরা ছাত্র হিসেবে সে সুযোগ পেয়েছে 'নাসা'র একটি মহাকাশ গবেষণা-কেন্দ্রে যোগদান করার। বিদেশের বৃত্তি আর দেশের উৎসাহে—সে চলেছে 'বোয়িং' বিমানে চ'ড়ে আমেরিকা। কিছুক্ষণ আগেই অতীত দিনগুলোর কথা, আগামী সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে, আর ফেলে আসা মাতৃভূমি ভারতবর্ষ—বিশেষ ক'রে মহান হিমালয়ের বৈচিত্রের বিষয়ে লেখা একটি ইংরিজী প্রবন্ধের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল তার। তারই মধ্যে এতসব কাণ্ড ঘ'টে গেল! আশ্চর্য!

তবু অলকেশ ভাবতে চেষ্টা করে—যা' দেখলাম, যা' শুনলাম তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? আর বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগেই না একে ফেলা যায়? সমাজ-বিজ্ঞানও বাদ পড়েনি গোটা উপন্যাসটি থেকে! আশ্চর্য! ভাবতে চেষ্টা করে—আমেরিকা গিয়ে তার প্রফেসর্ ডাঃ গ্রাহামকে বলবে নাকি গোটা ব্যাপারটা? বিশ্বাস করবেন কি তিনি, ভেবে দেখবেন কি এহেন সম্ভাবনার কথা? নাকি, পাগল ভেবে তাকে তিনি ফেরত পাঠিয়ে দেবেন ভারতবর্ষে!

রক্ষাকবচ

"আমাকে একটু কাগজ দেবেন ?..." নম্র মৃদু অনুরোধ, শেষাংশ শোনাই গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—দরজার ভেতরটায় দাঁড়িয়ে মাঝারি উচ্চতার কাল ছিপছিপে একটি ছোক্‌রা। ছোক্‌রা ঠিক বলা চলে না, বয়েস বোধহয় তিরিশের ওপরই হবে। পরনে আধ ময়লা ধুতি, ঠিক একই রকমের সাদা পাঞ্জাবী; পায়ে চপ্পল, কাঁধে সরু লম্বা একটা ঝুলি—প্রায় হাঁটুর কাছ পর্যন্ত ঝুলে আছে। ঝুলির নিচের অংশটা গোলাকার, দেখলেই বোঝা যায়—বাটি বা হাঁড়ি জাতীয় কিছু একটা আছে তার মধ্যে।

বসেছিলাম একটা পুরোন মেরামতির দোকানের কাউণ্টারের বাইরে রাখা ছোট্ট একটা চেয়ারে; কলকাতার ধর্মতলা ষ্ট্রীটের কোল ঘেঁসে ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের ওপর। কাউণ্টারের অপর পিঠে দোকানের মালিক অথবা কর্মচারী আমার ক্যামেরাটা মেরামতির ব্যাপারে এষ্টিমেটের জন্যে দোকানের ভেতরে কারিগরদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নির্বিকার ব'সে ব'সে ঝিমোচ্ছিলেন। বৈশাখের শেষ, দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে—বাইরে যেন আগুন ঝরাচ্ছে। এ সময় কিছুক্ষণ ওখানে ব'সে থাকতে পাওয়াও লাভ। তাই তাড়া ছিল না আমার।

আমার সঙ্গে দোকানীও তাকালেন। আগন্তুক আবার বললেন সেই রকম মৃদু স্বরে, "আমাকে একটু কাগজ দেবেন ?..." এবারেও বক্তব্যের শেষ অংশটুকু শোনা গেল না। মালিকটি বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—"কি চাইছেন ?" লোকটি বলল—"কাগজ"। "কি কাগজ, কি হবে ?" ঝাঁজিয়ে উঠলেন দোকানদ

লোকটি এবার সামান্য স্পষ্ট ক'রে বলে—"এক টুকরো কাগজ দেবেন? সাপকে জল খাওয়ার?" "কি বললেন!" —দোকানদারের বিস্ময়মাখা প্রশ্ন। লোকটি খুবই নিরীহ সুরে বলে—"রোদের যা তাত, সাপটাকে একটু জল খাওয়াতে পারলে ভাল হ'ত। তাই এক টুকরো কাগজ চাইছি।" "বলেন কী! সাপকে জল খাওয়াবেন কী? কোথায় সাপ?" একসঙ্গে অনেকগুলো ব্যস্ত প্রশ্ন ক'রে ফেলেন দোকানদার। আমি নির্বাক।

আগন্তুক এবার কাঁধের ঝুলিটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জবাব দেয়—"এর মধ্যে। মেডিকেল কলেজ তো এখনও অনেকটা পথ, তাই একটু জল খাইয়ে নেব ভাবছি সাপটাকে।" দোকানদার এবার সবিস্ময়ে বলেন—"ওর মধ্যে সাপ কি মশাই? কী সাপ? লোকটি বিনীত ভাবেই জবাব দেয়—"কালনাগিনী সাপ। মেডিকেল কলেজে বিক্রি করি তো, তাই নিয়ে যাচ্ছি।" প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পায়—লোকটি একজন সাপুড়ে, নিবাস দক্ষিণ ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে; বিষাক্ত সব সাপ ধ'রে ধ'রে মেডিকেল কলেজে বিক্রি করে। কখনও বা বিষ দাঁত ভেঙে খিদিরপুরেও বিক্রি হয়। তবে মেডিকেল কলেজেই দাম পাওয়া যায় ভাল।

প্রায় বিনা অনুরোধেই লোকটি ঝুলির মধ্যে থেকে ছোট্ট একটি মাটির হাঁড়ি বার ক'রে মেঝেতে রাখে। ওপরে ঢাকা দেওয়া সরাটা সরাতেই দোকানদার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন। আমার কাঁধের ওপর একটা খোঁচা মেরে আমাকে কাউণ্টারের ভেতর চ'লে আসতে অনুরোধ করেন। আমি নির্বিকার বসে থাকি।

আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে আগন্তুক হাঁড়ির মধ্যে ডান হাতটা ঢুকিয়ে—সরু মত কালো রংয়ের হাত দু'য়েক লম্বা একটা সাপের লেজ ধ'রে বাইরে বার করার চেষ্টা করতে থাকে। সাপটা কিছুতেই বাইরে আসবে না। লোকটি যতই চেষ্টা করে, সাপটি ততই সড়সড় ক'রে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

কিছুতেই বাইরে আসতে চায় না। শেষ পর্যন্ত লোকটি সাপটির লেজ ধ'রে ঝুলিয়ে রেখে দেখায়, আর বলে—"এ আসল কাল-নাগিনী। পরশু বিকেলে ধরেছি। ভাল দামে বেচতে পারবো মেডিকেল কলেজে, এর বিষের চাহিদা দারুণ।"

দেখলাম সত্যিই সাপটির মাথায় "চক্কর" আছে, ফণা না তোলায় প্রকৃত আকৃতি বোঝা যাচ্ছে না। সাপটির আচরণ দেখে--দোকানদার ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে ব'লে ওঠেন—"ছের মশাই, একটা মরা সাপ, চক্করই তোলে না।" জবাবে সেই একই বিনীত উত্তর—"জিনিষটা রয়েছে কিনা, ওতো মাথা তুলবে না। তবে একেবারে টাটকা, পুরো বিষটাই ধরা আছে—তা না হ'লে দামই পাব না।" "জিনিস ? সেটা আবার কি ?"—সকৌতুক প্রশ্ন দোকানদারবাবুর। লোকটি মৃদু স্বরেই বলে--"আমাদের তো জিনিস ছাড়া থাকা চলে না, সব সময়েই কাছে রাখতে হয়। মা মনসার বাহনরা না হ'লে 'ছুঁইয়ে' দেবে।" ব'লেই কপালে হাত ছোঁয়ায়। দোকানদারের আগ্রহ বেড়ে যায়। "কি জিনিস জিনিস করছেন তখন থেকে ? জিনিসটা আবার কী ?" লোকটা জামার বোতাম খুলে বুকের কাছে হাত চালিয়ে দিয়ে লাল সুতোয় বাঁধা এক টুকরো সাদা রংয়ের পদার্থ বার ক'রে আনে। দেখতে ঠিক ছাল তুলে ফেলা গাছের শেকড়ের মত। বলে—"এ গুরুর দেওয়া জিনিস, চিতেয় ওঠার দিন পর্যন্ত এ আমাদের সঙ্গের সাথী বাবুমশাই। এটি আছে ব'লেই না কালনাগিনী মাথা তুলছে না, তা না হলে ওর তেজ একবার দেখতেন।" লোকটি তার 'জিনিসটা' একটু দূরে সরিয়ে রেখে—কালনাগিনীর তেজ দেখিয়ে দেবার প্রস্তাব করে, কিন্তু দোকানদারের দারুণ আপত্তিতে তা আর হ'য়ে ওঠে না। আমাকে নির্বিকার ব'সে থাকতে দেখে ভদ্রলোক যা-তা বলতে থাকেন, আমার গোঁয়ার্তুমির ফল একদিন পেতে হবে ব'লে ভবিষ্যতবাণী করেন।

তারপর যেমনটি ঘটে। একতরফের জেদাজেদি, অন্য তরফের

আপত্তি এবং পরে দরাদরি। শেষে, পরিশেষে সেই অমূল্য "জিনিসটির" প্রায় একইঞ্চি পরিমাণ অংশ দোকানদারের পকেটস্থ, এবং দোকানের ক্যাস বাক্স থেকে পঞ্চাশটি টাকা "সাপুড়েটির" ট্যাঁকস্থ। দোকানদার ভদ্রলোক 'রক্ষাকবচ' পেয়ে গিয়ে সারা জীবনের জন্যে সাপের ভয় থেকে মুক্ত।

আমি ব'সে ব'সে তখনও ভাবছি—'লক্ষ্য'টি কি আমিই ছিলাম ? নাকি দোকানদারটিই ? আমার সহজাত 'রক্ষাকবচ'টি যে এখনই আমাকে মগজ-ওয়ালা সাপের হাত থেকে রক্ষা করলো, তা কি ওরা বুঝলো ?

ভরা দুপুরে

বি. এ ফাইন্যাল পরীক্ষা সবে মাত্র শেষ হয়েছে, হাতে অপর্যাপ্ত সময়। এমনি সময়ে আহ্বান এলো—পিসতুতো দাদার কাছ থেকে—দিন কয়েক তাঁর কাছে গিয়ে থেকে আসবার জন্যে। স্টেট্ ব্যাংকে ভাল কাজ করেন তিনি। সস্ত্রীক বাস সাহেবগঞ্জে—সেই সুবাদে।

সবে গোঁফের রেখা পুরুষ্টু হতে সুরু করেছে। বাড়ীর লোকেদের—বিশেষ ক'রে মায়ের—ঘোরতর আপত্তি আমাকে একলা ছাড়ার ব্যাপারে। একরকম জোর ক'রেই চলে আসতে পারা গেল—প্রায় সকলকে রাজী করিয়েই—কেবলমাত্র বাবার ওকালতীর জোরে।

ভোরের দিকেই পৌঁছে গেলাম। বাড়ী খুঁজে পেতে মোটেই অসুবিধে হ'ল না—এমন চমৎকার ভাবে ঠিকানার বিবরণ লিখে পাঠিয়েছিলেন বৌদিটি।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই—একটু বাইরে যাবার তাল করছি. বৌদি বাধা দিলেন—"রাত জেগে এসেছো, এখন বাইরে না বেরিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। তারপর বিকেলে তোমার দাদা ফিরলে—সকলে মিলে বেড়াতে যাব।" 'এক্ষুনি আসছি'—বলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা সিগারেট না খেতে পারলে—মেজাজ ঠিক থাকছিল না। দাদার সামনে খাইনা, বৌদির সামনে এখনও সুরু করা হয়নি, হয়ে ওঠেনি।

রাস্তায় নেমে তিন পা' হাঁটতেই—সামনে একটা স্যাকরার দোকান। চাকচিক্য নেই, তবু কেন জানিনা নজরে পড়লো। দোকানে মাত্র একজন ভদ্রলোক। মনে হ'ল মালিকই, বসে ছিলেন। চোখাচোখি হ'তেই ডাকলেন—ইশারায়। সোজা ভেতরে চ'লে এসে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললুম—"বলুন।" "না, এমনিই ডাকলুম। বাঙালী দেখলে কথা না ব'লে পারিনা। তা কবে আসা হ'ল? বিনোদবাবু কে হন?" আমি কোথায় এসেছি তাও জেনে

গেছেন দেখছি—মনে মনে ভাবি। মুখে বলি—"মাত্র আজ সকালে, — দাদা হন।" পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ঠোঁটে লাগিয়ে জানতে চাই—"চলবে নাকি ?" "না ভাই, আমার চলে না। আগে বিড়ি খেতুম, তা গত পাঁচ বছর তাও বন্ধ।" "হঠাৎ ?" —জানতে চাই। সলজ্জ জবাব—"গিন্নি পছন্দ করেন না।" একটু কৌতুক ক'রেই বলি—"পাঁচ বছরই বিয়ে হ'য়েছে বুঝি ?" সলজ্জ জবাব—"হ্যাঁ, একটু লেটেই বিয়ে করেছি। করবোনা-ই ভেবে-ছিলুম—তা, শেষ পর্যন্ত ক'রে ফেলতেই হ'ল।" এমনি ধরনের আলাপচারী চলতে থাকলো। সিগারেটটা শেষ হ'য়ে এসেছিল—আবার কখন সুযোগ মেলে কে জানে ভেবে—আর একটা ধরালাম। ভদ্রলোক বললেন—"তা, চলুন না—আমার বাসায়—গল্পগাছা করা যাবে। এখনই তো যাচ্ছি বাসায়।" একটু অবাক লাগলো। বোধহয় বুঝে নিয়েই বললেন—"বাঙালীতো বড় একটা জোটে না—আমার স্ত্রীও দু'টো কথা বলতে পেলে খুশি হবে।" তাড়াতাড়ি জবাব দিই—"না, না, তা' কি হয় ? আর আমাকে এখনই উঠতে হবে। পাঁচ মিনিটের কড়ারে বেরিয়েছি।" বলেই উঠে পড়লাম।

ভদ্রলোক না-ছোড়-বান্দা। বললেন—"ঠিক আছে, আজ থাক, কাল কিন্তু যেতেই হবে বাসায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই চ'লে আসবেন। বারটা নাগাদ দোকান বন্ধ ক'রে বাসায় যাই—তখনই যাবেন। দুপুরটা গল্প ক'রে কাটবে ভাল। কাল আসা চাই কিন্তু।" "ঠিক আছে, ঠিক আছে" —ব'লে উঠে পড়লাম।

বিকেলে দাদা-বৌদির সঙ্গে গঙ্গার দিকটা বেড়িয়ে আসা গেল। আমাদের হুগলীর গঙ্গার সঙ্গে তুলনাই চলে না, তবে বেড়াবার জায়গা হিসেবে মোটেই সুবিধের নয়। পরের দিন খুব ভোরে উঠে একা-একাই কাছের পাহাড়ের দিকটা বেড়িয়ে এলাম। বৌদিকে কথা দেওয়া ছিল—তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তবে পাহাড়ে উঠবো। তাই আর ওপরে উঠলাম না।

দাদা অফিস বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—খাওয়া-দাওয়া

সারতে হ'ল বৌদির তাগিদে। ঘণ্টাখানেক বৌদির সঙ্গে 'ফিস্' খেলার পর দেখি বৌদি শোবার তাল করছেন। মেদ-বৃদ্ধির ভয় দেখানোতেও কাজ হ'ল না। অগত্যা কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি নিয়ে—"একটু বেড়িয়ে আসি"—ব'লে বেরিয়ে পড়লাম। অজ্ঞাত আকর্ষণে সেই স্যাক্‌রার দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তৎক্ষণাৎ আহ্বান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান বন্ধ ক'রে—আমাকে প্রায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে চললেন বাসার দিকে। পাশের গলিতে ঢুকেই বাঁ দিকের প্রথম বাড়ীটার দোতলায় এঁর বাসা। কড়া নাড়াতেই দরজা খুলে গেল। একজন মহিলাকে পাশে স'রে দাঁড়াতে দেখলাম—মাথায় ঘোমটাটা অল্প একটু টেনে দিতে দিতে। ইনিই নিশ্চয় এঁর স্ত্রী- যাঁর নাকি বাংলা ভাষায় আলাপের বাসনা প্রবল।

সোজা দোতলায় উঠে গিয়ে সামনেই শোবার ঘরে নিয়ে তুললেন। বিছানাতেই বসতে বললেন। ইতস্ততঃ করতে দেখে প্রায় জোর ক'রেই বসিয়ে দিয়ে বললেন--"অত 'পর' 'পর' ভাবা চলবেনা ভাই।" গিন্নিটির দেখলাম—বয়স বেশী নয়—আমার চেয়ে বড়জোর ২/১ বছরের বড় হ'তে পারেন। দেহের বাঁধুনি মজবুত, রং মাজামাজা, মুখশ্রী মন্দ নয়—সব মিলিয়ে দেখতে 'মন্দনয়'-ই বলা চলে। দু'হাতে দুটো কাঁচের গ্লাসে সরবত নিয়ে এসে ঢুকলেন ঘরে। ছোট টেবিলটার ওপর স্বামীর জন্যে একটা গ্লাস রেখে, আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই এগিয়ে ধরলেন গ্লাসটা আমার দিকে। আমি মুখ তুলে তাকাতেই বললেন—"এটুকু খেয়ে নিন্।" চুমুক দিয়েই বুঝলাম—মিছরীর সরবত, নেবুর রস সহযোগে। মনে হ'ল এটি এ সময়ে স্বামী দেবতাটিকে নিত্যই উপহার দেওয়া হয়—আজ বোধহয় জল মিশিয়ে একটু বাড়িয়ে নিতে হ'য়েছে।

ভদ্রমহিলা খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি সরবতে চুমুক দিতে থাকলাম। স্বামীটি এক চুমুকে শেষ ক'রে, মাথায়

তেল ঘসতে ঘসতে গামছাটা কাঁধে ফেলে—"আসছি ভায়া" ব'লে ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন। আমি—আমরা একা। কিছু একটা বলা দরকার ভেবে ব'লে ফেলি—"আর কেউ নেই ? মানে ছেলে-পুলে······" ঘরের বাইরে থেকে প্রায় ধমকের মত শোনায় ভদ্র-লোকের গলা—"আপনি গল্প করুন ভায়া। চৌবাচ্ছায় জল আছে তো গো ?" ভদ্রমহিলা টুক ক'রে জবাব দেন—"আছে"। আমার কথার জবাবে মুখ নিচু করলেন। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে খালি গ্লাসটা নিয়ে বললেন—"ভাল ক'রে পা তুলে বসুন না উঠে। এখনই তো আর যেতে পারছেন না।" একটু ইতস্ততঃ হয়তো ক'রেছিলাম,—এমন ভাবে তাকালেন—পা দুটো উঠিয়েই নিতে হ'ল। বলতে শুনলাম—"আজ আপনি আসবেন শুনে, কাল থেকে—দুটো কথা ব'লে বাঁচবো ভেবে—অস্থির হচ্ছি।" আমার সাড়া না পেয়ে, একটু থেমেই বললেন—"গ্রামে বাপের বাড়ী, আপনাদের হরিপালে নেবে যেতে হয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটিবার মাত্র যেতে পেরেছি—এক হপ্তার জন্যে, ব্যস।" আমি চুপ্‌চাপ। কী যে বলবো, বুঝছি না। এঁরা দু'জনেই দেখছি আলাপী—একটু 'বাচালই' যেন। তারপর শুরু হ'ল—আমার বৃত্তান্ত জানবার প্রচেষ্টা—নানা প্রশ্ন, নানা ধরনের। বিস্ময় যত বাড়তে থাকে—অজানা একটা অনুভূতিও জাগতে থাকে মনের মধ্যে। "কী ব্যাপার রে বাবা"—মনের মধ্যে এমনি একটা ভাব ঘোরাফেরা করতে থাকে।

ভদ্রালাক মাথাটা ভাল ক'রে মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকেন। ভদ্রমহিলা বোধ হয় রান্না ঘরের দিকেই পা বাড়ালেন। স্বামীটি বললেন—"এখানেই খেতে দাও না, কথা বলতে বলতে খাওয়া যাবে।" একটু ইতস্ততঃ, তারপরই দেখি ঘরের মেঝেতে 'ঠাঁই' ক'রে খেতে দিলেন তাঁকে। গল্প ঠিক নয়—এক তরফাই প্রায় বাক্যস্রোত বইতে থাকলো। আমার 'অবাক' ভাবটা ততক্ষণে

হয়তো কিছুটা ক'মে থাকবে। ভদ্রলোক আহার শেষ ক'রে, মুখ ধুয়ে এসে, একটু দূরত্ব বজায় রেখেই এসে বসলেন খাটের অপর প্রান্তে। সামনে বাড়িয়ে ধরা রেকাবী থেকে দু'খিলি পান তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে লাগলেন চোখ বুজে। আমাকেও এক খিলি মুখে দিতে হ'ল উপরোধে।

মিনিট তিন-চার চুপচাপ। সকলেই নীরব। হঠাৎই ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন—"কিছু মনে করবেন না ভায়া—আমাকে এখনই একটু দোকানে বেরুতে হচ্ছে—একটা বিয়ের অর্ডার আছে।" বিস্তারিত করার জন্যে যোগ করলেন—"সাঁওতালদের বিয়ে, রূপোর হাঁস্‌লীর বায়না ; আজ সন্ধ্যের মধ্যেই তৈরী চাই।" আক্ষেপের সুরে ব'লে চললেন—"আমার তো আর কর্মচারী নেই, নিজেকেই একা হাতে সব ক'রতে হয়।" নিস্তার পেতে তা হলে বিলম্ব নেই ভেবে, উৎসাহিত করি—"বেশ তো চলুন না, আপনি কাজ করবেন, আর আমি আরও মিনিট কয়েক ওখানে বসেই গল্প করবো—সেই ফাঁকে সিগারেট খাওয়াও চলতে থাকবে।"—ব'লেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম। "হাঁ, হাঁ, ক'রে উঠলেন ভদ্রলোক। "সে কি কথা, আপনি যাবেন কী? আপনি গল্প করুন আশার সঙ্গে। বিকেলে চা খেয়ে তবে বেরুবেন। আমি না হয় চারটে নাগাদ একবার চলে আসবো চা খেতে।" মনে মনে যতই ব'লে উঠি--'অসম্ভব', মুখ দিয়ে কিন্তু কথাটি বার করা গেল না কোন মতে। বিশেষ ক'রে 'আশা'টির চোখের যা চাউনি —কেমন যেন অবাধ্য হওয়া যায় না এদের। মুখে ভাষা নেই, চোখে কিন্তু শাসনের তর্জন। ভদ্রলোক গা' তুললেন পত্রপাঠ। আমি একা, একেবারে একা—অসহায়। মৃদু মৃদু ঘাম দিচ্ছিল কি?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। আশা-ই প্রথম কথা বললেন। "আপনাকে একটা বিশেষ কারণেই আটকেছি। আমাদের—আমার একটা উপকার করতেই হবে কিন্তু। দেখছেনই তো, আমাদের সংসার। দু'টি মাত্র প্রাণী। আপনাকে একটু দয়া করতেই হবে।"

"আমি, আমি····"—বোধ হয় এই দু'টি কথাই বার হ'য়েছিল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। তারপরই চুপ ক'রে যেতে হ'য়েছিল—সেই চাউনীর সঙ্গে চোখ মিলতেই। নরম, স্নিগ্ধ চাউনী। কিন্তু তার আদেশ অমোঘ। এ চাউনী দিগ্বিজয় ক'রতে পারে। এ চাউনী দুর্লভ। একে অবহেলা করা যায় না, বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। চুপচাপই বসে থাকি, চোখ থাকে ঘরের মেঝের দিকে স্থির। ঘরের এক কোণে নজর পড়ে। ছোট্ট একটা সাইন বোর্ড, বোধহয় মেরামতির জন্যেই রাখা আছে একপাশে। ইংরিজীতে লেখা—"মডার্ণ জুয়েলার্স, ফিস্ মার্কেট, সাহেবগঞ্জ, প্রোঃ—নিরাপদ মল্লিক"। মনটাকে অন্যদিকে দিতে পেরে একটু স্বস্তি পাচ্ছিলাম। ভদ্রলোকের নামটা জিজ্ঞেস করাই হয়নি দেখ্‌ছি, এখন জানা গেল—'নিরাপদ।'

আমাকে একেবারে চুপ দেখে প্রায় কৈফিয়তের সুরেই বলেন আশাদেবী—"চেনা-জানা লোকের কাছে লজ্জা বেশী, আপনি বিদেশী—দু'দিন বাদেই চ'লে যাবেন। আমার চেয়ে ওঁর লজ্জা অনেক বেশী, তাই কাজের ওজর দেখিয়ে দোকানে চ'লে গেলেন। যেন জানেনই না এমনি ভাব দেখানো যাবে—এই ভেবে।"

আমি দরজার দিকে তাকাই—পালাবার পথটা সরল কিনা বোঝবার চেষ্টা করি। "আপনি কি ভাবছেন জানি"—আশা ব'লে চলেন—"ভাবছেন—কি বেহায়া রে বাবা। অন্য উপায় থাকলে আপনাকে আটকাতাম না।" আমাকে বলতেই হয়—"না, না, তা নয়।" উনি ব'লে চলেন—"বাপের বাড়ীতে মা আর একটি বোন ছাড়া কেউ নেই। মা অনেক কষ্টে বোনটির জন্যে একটি পাত্র ঠিক করেছেন—সামনের মাসে বিয়ে। মা চান সে সময়টা আমি ওখানে গিয়ে থাকি, আর কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করি। আমাদের সংসার তো দেখছেন—আমি চ'লে গেলে ওঁকে হাত পুড়িয়ে খেতে হবে, আর ওঁর পক্ষেও দোকান ফেলে যাওয়া চলে না। তাছাড়া দু'জনের যাতায়াতের গাড়ীভাড়ার টাকাটাও যদি

মাকে বাড়তি দিতে পারি—এ সময়ে তাঁর অনেক কাজে লাগে"
তাই, যাবনা-ই ঠিক করেছি।"

এসব কথা আমাকে শোনানোর অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। তবু, বিপদ এখনও নিকট নয় বুঝে স্বস্তি পাচ্ছিলাম। আর একবার রেকাবীটা হাতে নিয়ে প্রায় আমার কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন। তাতে এখনও একখিলি পান। "পান আমি বেশী খাইনা"—ব'লে একটা সিগারেট ধরালাম। আশা রেকাবীটা টেবিলটার ওপর রেখে এসে আবার আমার কাছটিতে খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়ালেন। "গত হপ্তায় মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে—বোনের হাতের লেখা। নিচের তলার ভাড়াটেদের একটা বাচ্ছা ছেলে—একটু-আধটু বাংলা প'ড়তে পারে—তাকে দিয়ে পড়ালাম—বোনের বিয়ের খবরটা। তার বিদ্যে ঐ পর্যন্ত। আমাদের—আমার বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ, আর ওঁব বোধ হয তাও নয়। শুনেছি, ছোটবেলায় বাড়ী থেকে পালিযে এসে এখানে ঐ স্যাক্রাব দোকানে চাকরী শুরু করেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু। দোকানের মালিকের সংসারে কেউ ছিল না। ওঁকেই তিনি ছেলেব মত ক'রে নেন্। লেখা-পড়া শেখার ওঁব ইচ্ছেও ছিল না, সুবিধেও হয়নি। তবু বুড়ো ওঁকে ছেলের মতই ভালবাসতেন। তিনিই ওঁব বিয়ে দেন। আমাদের গাঁয়ের এক কাকার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়—যখন তিনি এখানে হাওয়া বদল করতে এসেছিলেন। সেই কাকাই সম্বন্ধ করেন। মায়ের তখন যা' অবস্থা—তিনি হাতে চাঁদ পেযে যান। নি-খরচায় বিয়ে। আর অন্ততঃ একটা পেট তো ক'মলো। বুড়ো মরবার আগে দোকানটা ওঁকে দিয়ে যান, আর পুরোন ভাড়াতেই এই বাসাবাড়ী। দোকানের আয় নেই বললেই চলে—কোন রকমে চলে যায়। উনি লেখা-পড়া জানেন না, হিসেব-নিকেশ তো নয়ই। তবু তা লোককে বুঝতে দেন না লজ্জায়। লোকে যে ওঁকে ঠকাচ্ছে তা আন্দাজ করতে পেরেও কিছু বলতে পারেন না। হিসেব বোঝেন না—তা ধরা পড়বার ভয়ে হাসিমুখে যে যা দেয়

নিয়ে নেন।" কথা বন্ধ ক'রে আশা এবার যেন একটু দম নেন। আমি আবার ভাবতে থাকি, এসব আমাকে শোনানো কেন?

"একটু চা ক'রে আনি?" জানতে চান আশা। তাতে আরও কিছুক্ষণ আটকে পড়তে হ'বে ভেবে—আমি আপত্তি জানাই। আশা আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ান। আমি যেন একটু কুঁক্‌ড়ে বসি। উনি হঠাৎ ব'লে ওঠেন—"একবার উঠুন তো।" আমি ওঁর মুখের দিকে তাকাই। সেই চোখ, সেই দৃষ্টি। আমি উঠে দাঁড়াই জড়সড় হয়ে। "আপনি না সহরের ছেলে, এত লাজুক কেন? আর একটু এপাশে এসে দাঁড়ান না।" আমি স'রে দাঁড়াই—একটু তফাতেই। তিনি—আমি এতক্ষণ যেখানটায় ব'সেছিলাম—সেই-খানের বিছানার তোষকটা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে কি যেন একটা বড় সাইজের কাগজ বার ক'রে আনেন। তারপর সেটা আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বলেন—"এই ফরম্‌টাতে যা যা লেখবার দয়া ক'রে লিখে দিন না—অনেকদিন ধ'রে জমানো এই পাঁচশোটা টাকা মা-কে মণি-অর্ডার ক'রে পাঠাতে হবে। এই কাগজের টুকরোটায় মায়ের ঠিকানা লেখা আছে। আর, একটু গুছিয়ে লিখে দেবেন—আমাদের যাবার অসুবিধের কথা—যা-যা বললাম এতক্ষণ ধ'রে। আর, লিখবেন—মা যেন আমাদের ক্ষমা করেন। হ্যাঁ, আর আমাদের আশীর্বাদ জানাবেন বোনটিকে। সে যেন মন খারাপ না করে। ওর নাম নিশা।"

আমি চুপচাপ শুনে যাই। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে। তবু কেন যেন মনের মধ্যে ছোট্ট একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ ক'রতে থাকে—কেন কে জানে।

আশা এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার সলজ্জ মুখ তুলে বলেন—"ফেরার পথে আবার ওঁকে এসব কথা শুনিয়ে যাবেন না যেন—বড় লজ্জা পাবেন তাতে উনি।"

দু'পারের মাঝখানে

এপারে এসেও যে ওপারের কথা মনে পড়ছে, মনের মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রছে। তা'হলে এপারে এলেও ওপারের মনটা সঙ্গে আসে? অথচ ওপারে থাকার সময় কতবারই তো ভেবেছি—এই মনটাও সঙ্গে যাবে কি? জবাব পাইনি তখন। ওপারে কি শুধু দেহটাই ফেলে আসতে হয়? আত্মাই তো শুনেছি শুধু এপারে ওপারে সমান—একই। আর মনটা? তাও কি আত্মার মতই অবিনশ্বর? না কি কিছুক্ষণ ওর ক্রিয়া-কলাপ চালু থেকে আস্তে আস্তে মনটাও দেহের মতই মরে যাবে? কিন্তু দেহটাও তো সঙ্গে সঙ্গে 'মরে' না। ওটাকে পুড়িয়ে বা পুঁতে না ফেললে ওটাও তো ধীরে ধীরে 'মরে' গিয়ে, ধীরে ধীরে পচে গলে বিলীন হয়ে যেত—পঞ্চভূতে। মনটাও কী তেমনি ধীরে ধীরে মরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে একেবারে?

এখনও কই সব কথা,—ওপারের সব কথা—মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে না। ছেলে, মেয়ে, বউ, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সাধের বাসগৃহ—কিছুই তো তেমন ক'রে মনটাকে জুড়ে থাকছে না, কত কাজই তো অসমাপ্ত থেকে গেছে, কত কথাই তো ব'লে আসা হয়নি। কই—তার জন্যে তো মনে কোন উদ্বেগ বা অস্বস্তি নেই। তা'হলে কি মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে—শুধু মাত্র বিলীন হ'য়ে যাওয়ার পথেই, মনটা কিছু কিছু কাজ ক'রে চলবে? কেবলই তো মনে পড়ছে—হঠাৎ ওপার থেকে এপারে আসার ঘটনাটা। অথচ, তার জন্যে কোন আতঙ্ক নেই, কোন খেদ নেই মনের কোণেও—শুধু একটা নির্লিপ্ত ঘটনা প্রবাহ যেন এখনও মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর মজার কথা এই—'সেই' ঘটনাটাই শুধু বারে বারে ছবির মত মনের পর্দায় ভাসছে, ভেসে বেড়াচ্ছে।

ওপার থেকে এপারে পার হ'য়ে আসার সময়ে কত ঘটনাই তো

ঘ'টে থাকে লোকের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে খাঁচার দরজাটা খুলে যায়—সামান্য তাড়া—তাতেই যেন পাখীটা খাঁচার দরজা দিয়ে বার হ'য়ে—খাঁচাটার মাথায় কিছুক্ষণ ব'সে থেকে—আকাশটাকে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে—তবেই পাখা মেলে মহাশূন্যে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মোটেই সে রকমটা ঘটলো না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কায়—খাঁচাটাই ভেঙে চুরমার—আর পাখীটা যেন ছিট্‌কে বার হ'য়ে এলো তা থেকে। এসেই শূন্যে পাখা মেললো। ধ্যেৎ, আবার সেই পার হ'যে আসবার দৃশ্যটা জ্বালাতন ক'রছে, মনের মধ্যে জেগে উঠছে।

বাসে উঠেই ভাগ্যগুণে বসবার একটা জায়গা পেয়ে গিয়েছিলুম, যদিও অনেকে আমার থেকে আগে উঠেও দাঁড়িয়েছিল সারা বাসটায়। কথা কেউ বিশেষ বলছিল না, তবু সকলের সম্মিলিত একটা মৃদু গুঞ্জন কানে আসছিল। আমি চোখ বুজে ব'সেছিলুম। ঝিমোচ্ছিলুম, নাকি তন্দ্রা আসছিল ? কানে আসছিল শুধু কণ্ডাক-টারের কর্কশ গলা। "জানানা—বাচ্ছা—ঠিক হ্যায।" আব দীর্ঘ বিরতির সঙ্গে—"কাঠগোলা—মাসীবাড়ি—শংকার—জন্নাঘাট—খটবাজা—চম্পাবোড—সনজেবাজা—পন্‌চান্‌তালা—জ্যেন্তি—" সব পরপরই তো মনে পডছে। এবার হয়তো একটু ঘুম এসেছিল। তারপব আবার কানে আসছিল—"বাগখাল—হাতিকুল—বিশালাখি—বারামন্দিল—" তারপরই- 'দডা-য়া·ম।' প্রচণ্ড একটা ধাক্কা—কিসের সঙ্গে কে জানে ? ছিটকে প'ড়েছিল—আমার দেহটা। চুবমাব হ'য়ে গিয়েছিল যেন। আব পাখীটা ? সেটা যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছলো—আকাশের দিকে। বারবার তো এই দৃশ্যটাই মনের মধ্যে ভাসছে—হালকা ভাবে—নির্লিপ্ত ঘটনা যেন একটা। হঠাৎ মনে পড়ে বাসের ভাড়াটা তো দেওয়া হয়নি। কেন কে জানে—ট্রামে-বাসে আমার কাছে সাধারণতঃ ভাড়া চাইতো না কণ্ডাকটাররা। ভাবতো—নিশ্চয়ই দিয়ে দিয়েছি। আমাকেই অধিকাংশ সময়—ওপর পড়া হ'য়ে ভাড়া দিয়ে দিতে হ'ত। কিন্তু

শেষের বারেরটা তো দেওয়া হল না। যাক্‌গে কী আর হবে ? সবই তো প'ড়ে রইল আমার—নাওনা বাবা যে যার হিস্যা বুঝে। আর তোমাদের বাসও তো চুরমার, কণ্ডাকটারের পয়সার ব্যাগটা কোথায় কিভাবে আছে তাইবা কে জানে ? ও নিজেই এখন ওপারে, না এপারে—তাবই বা ঠিক কি ?

এইবার বুঝতে পারি—আমি এখানে একেবারে একা। কেন, —সহযাত্রীরা সব গেল কোথা ? কেউ-ই কি তাদের মধ্যে পার হয়ে আসতে পারে নি ? অসম্ভব। তাছাড়া—তার আগে যারা পার হয়ে এসেছে—তারাই বা কৈ ? এখানে সকলেই একা নাকি ? নাকি সক্কলে মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়ে—একেবারে 'একা' হয়ে গেছে ?

কতক্ষণ, কতদিন, কতযুগ—এপারে এসেছি—তা তো কই বোঝা যাচ্ছে না ! এখানে দিন-রাত্রি ব'লে কিছু নেই নাকি ? তাহলে কতদিন হল এখানে আসা তার হিসেব থাকবে কি ক'রে ? সে হিসেব কি তাহলে রাখাই হয় না ? নাকি আমারই বুঝতে ভুল হচ্ছে ?

হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে—কে যেন কিছু খাইয়ে দিচ্ছে। সে কি ? এখানেও 'ক্ষিদে-তেষ্টা' আছে নাকি ? কই ? অনুভব করছি না তো। তবু যেন কে কি খাইয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে যেন টানা-ছেঁড়া চলছে। আমার দেহই যখন নেই, তখন আর টানা-ছেঁড়া করে কি নিয়ে ? আর কেনই বা ? আবার এক একবার মনে হয়—যেন আমাকে নিয়ে কী সব গবেষণা চলছে। ব্যাপারটা কি ? এপারেও ওসব আছে নাকি ? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি ? আমাকে সব 'একঘরে' করেছে নাকি ? না এপারের, না ওপারের —কোথাকার বাসিন্দা আমি তাহলে ? ওপারের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে না গেলে, অথবা মন ব'লে পদার্থটার একেবারে বিলোপ না ঘটলে বোধহয় আমি এপারেও ঠাঁই পাব না। কিন্তু এমনটা কি শুধু আমার বেলাতেই ঘটছে ? নাকি সকলেরই এমন হয় ?

কিন্তু আমি তো এখনও সব ব্যাপারগুলোই—ওপারের সঙ্গে তুলনা ক'রেই বুঝতে চাচ্ছি। ওপারে যখন প্রথম যাই—তখনও কি তার আগের বারের 'এপারের' সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে হিসেব করেছিলুম—সেই শিশু-কালটায়? তাহলে এখন কি আমার এপারের সেই শিশুকালই চলছে? কে জানে!

একটু-আধটু যেন 'কথা' শুনতে পাচ্ছি। মানুষেরই গলা। কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু। কতকাল এমনি চলবে কে জানে? ঐ আবার কারা যেন কথা বলছে। আমার সম্বন্ধে বলেই তো মনে হচ্ছে। আমার কি-যেন নাম ছিল ওপারে? ঠিক মনে করতে পারছি না তো!

আমাকে যেন—ধোওয়া-মোছা করা চলছে, আরও কত কি করছে যেন কারা সব আমাকে নিয়ে। কিন্তু আমার শরীর ব'লে কিছু আছে কি? আমি তো কই অনুভব করতে পারছি না।

কারা যেন বলাবলি করছে—মানুষের গলায়—এতক্ষণে একটু যেন বোঝা যাচ্ছে। "আজ এগার দিন পরে জ্ঞান হল,—তাও মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে—" কে যেন বলল; গলাটা চেনা গেল না। চোখ খুলে দেখব নাকি কে কথা বলছে? ধ্যুৎ, আমার আবার চোখ আছে নাকি? আমি বোধ হয় শুধু অনুভব করতেই পারি। আবার কে যেন বলছে—"আপনার হাতে না পড়লে—এ যাত্রা ওঁকে বাঁচানো যেত না ডাক্তারবাবু।" জবাবে—ভারী গলায় কে যেন বলে—"এখনও সে সময় আসেনি, ভগবানকে ডাকুন। আমি চেষ্টা ক'রে চলেছি মাত্র।"

এরপর আমি আর কিছু বুঝতে পারিনি। জানিনা আর-কিছু। কিচ্ছু জানিনা।

অবিনাশ

"তোমার নামটি কী মা ?"—মোলায়েম প্রশ্ন করেন অবিনাশ।

"সুচরিতা চক্রবর্তী"—নম্র স্বরে জবাব দেয় মেয়েটি। 'সুচরিতা চক্রবর্তী'—শুনেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আবর্ত অনুভব করেন অবিনাশ। চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ। পাত্রীটি মুখ না তুলেই সসংকোচ দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করে তাঁর মুখের দিকে। অন্যেরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। "হাত দু'টি দেখি মা তোমার"—আবার শান্তকণ্ঠে বলেন অবিনাশ। মেয়েটি ধীরে ধীরে তার ছোট ছোট হাত দু'টি মেলে ধরে। দু'টি হাত বাড়িয়ে অবিনাশ মেয়েটির হাত দু'টি হাতে নেন। সামান্য উঁচু ক'রে ধ'রে তাকিয়ে থাকেন, দেখতে থাকেন। তারপর হাত দু'টি হাতে নিয়েই চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ। আবার সকলে—পাত্রীর মা-বাবা, দাদা, দু'একজন প্রতিবেশী—সকলেই আবার একবার অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। হঠাৎ অবিনাশ মেয়েটির হাত দু'টি উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে নিজের নাকের কাছে নিয়ে আসেন, গন্ধ শুঁকে দেখেন, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখেন। চুপচাপ ব'সে থাকেন অবিনাশ। কিছুক্ষণ—অনেকক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান।

মেয়েটি প্রায় কাঁদ কাঁদ। জীবনে এই প্রথম সে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন। অনেকে অনেক ভাবেই তালিম দিয়েছে তাকে। কিভাবে হাঁটতে হবে, কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে প্রণাম করতে হবে, কিভাবে কথার জবাব দিতে হবে, কী প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে। কত সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব মুখস্থ ক'রে নিতে হয়েছে তাকে। কিন্তু, এ কি হল ? কিছুই তো কাজে লাগলো না। তবে কি সে অনুত্তীর্ণ হল জীবনের এই প্রথম পরীক্ষায় ? পাত্রীর

অভিভাবকদের মনের অবস্থাও তদ্রূপ। কী হল? পাশ, না ফেল? চোখে মুখে সকলের শুধু এই জিজ্ঞাসা।

অবিনাশ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন দরজার দিকে। পাত্রীর বাবা সম্বিৎ ফিরে পান। এগিয়ে এসে, হাত দু'টি জোড় ক'রে কি যেন বলতে যান। তার আগেই অবিনাশ বলে ওঠেন,—"বিয়ের ব্যবস্থা করুন চক্কোত্তি মশাই। 'দিন-স্থির' ক'রে ফেলে আমাকে জানাবেন।" সোজা গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসেন অবিনাশ, তখনও তদ্গত অবস্থা তাঁর। গাড়ী চলতে থাকে—তিনি চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে কি যেন ভাবতে থাকেন।

* * *

বিশ বছর আগেকার একটি সন্ধ্যার একটি ঘটনায় ফিরে যায় অবিনাশের মনটা। সবে কাজ থেকে ফিরেছেন—হঠাৎ খবরটা কানে আসে। বাড়ীর কারো কাছে ওটা কোন খবরই নয়, তবু কিভাবে যেন আলোচিত হল এবং অবিনাশের কানে গেল। ওঁর কাছেও ওটা কোন খবরই নয়, হওয়ার কথাও নয়। তবু কেমন যেন হয়ে যান অবিনাশ। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চ'টি জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে। স্ত্রী বলে ওঠেন—"কি হল? চল্লে কোথা? চায়ের জল চাপিয়েছি।" কথা ক'টি যেন কানেই যায় না অবিনাশের। ধীরে ধীরে তিনি হেঁটে চল্লেন পথ দিয়ে—এবং যেন অজান্তেই গঙ্গার ঘাটে এসে পোঁছে যান ধীরে ধীরে।

ঘাটের একপাশে বসে পড়েন অবিনাশ। গঙ্গার শান্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছু দূরের শ্মশান থেকে তখন 'কাজ শেষ হওয়ার' বার্তা ঘোষিত হয়—"বল হরি······।" কিছুক্ষণ পরেই শ্মশান-যাত্রীরা এসে নামেন ঘাটে, স্নান-পর্ব শেষ হয়। ঘাটে বসে থাকা এক বৃদ্ধ বায়ু-সেবী কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানতে চান—"কে গেলেন ভাই?" সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়

একজন ছোকরা শ্মশান-যাত্রী—"চিনবেন কি ? ওঁর নাম 'স্বচরিতা চক্রবর্তী', আগে এখানেই থাকতেন।" অবিনাশও শুনতে পান জবাবটা। বাতাসের যেন ঘ্রাণ নেন একবার। বসে থাকেন, বসে বসে ভাবেন, বসে বসে দেখেন। দেখেন একটি জীবনের সমাপ্তি, যা অহরহই ঘটছে সর্বত্র। শুধু একটি নাম, যার সঙ্গে তাঁর সামান্যতম পরিচয়, এক্ষেত্রে শুধু সেইটুকুই সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে। শ্মশান-যাত্রীরা ফেরার পথ ধরেন। অবিনাশ বসে থাকেন, রাত বাড়তে থাকে। ভাবতে থাকেন। ঠিক কী যে ভাবেন তাও বোঝেন না।

* * *

বিশ বছর আগের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বারবার মনে প'ড়ে যায় ওঁর। মন থেকে মুছে যাওয়া, প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া একটা স্মৃতি যেন আজ বিশ বছর পরে হঠাৎ নতুন ক'রে ভেসে ওঠে মনের অতল থেকে—আনা-গোনা করতে থাকে মনের পর্দায়। স্মৃতিটুকু যে এতকাল সুপ্ত ছিল মনের কোন নিভৃত কোণে—এইটুকু বুঝেও অবাক হন। তবু না-ভেবে পারেন না, আবার নতুন ক'রে অনুভব না ক'রে পারেন না—বিশ বছর আগেকার সেই কয়েক মুহূর্তের ঘটনাটি।

ম্যাট্রিকের টেষ্ট পরীক্ষা শেষ। সকাল থেকেই ক্রিকেট খেলা চলছে পুরোদমে—কাছেরই এক শিক্ষায়তনের মাঠে। বয়েস তখন ওঁর পনের কি ষোল। তখনও এদিকে ক্রিকেট খেলা ভাল ক'রে চালু হয়নি। 'টেনিস-বলে' খেলা। তখন ব্যাট্ করছে কল্যাণ। ওকেই ভয়।. ব্যাট্ তুললেই 'ছক্কা।' তিনি ফিল্ডিং করছিলেন—'লেগের' দিকের বাউণ্ডারী সীমানার কাছে। ওঁর পেছনেই মাঠ শেষ। তার পেছনে কাঁটা তারের বেড়ার পরেই বাগান। তারপর সাহেবের বাংলো। না, না, 'বাঘের ঘর'। ওঁরা তাই বলতেন।

সাহেব—শিক্ষায়তনটির অধ্যক্ষ—নাকি মাটির মানুষ। ওঁরা ভাল ক'রে চিনতেন-ই না। কিন্তু মেমসাহেব? ওরেঃ বাপ্‌রে, 'বাঘিনী'। ওঁদের বয়সের সকলেই তাই মনে করত, ধারে কাছে ঘেঁষত না কেউ। ওদের চেয়ে যারা বয়েসে বড়—তারা ভাবত—মেমসাহেব আধুনিকা, বিদুষী, সুন্দরী, সপ্রতিভ। একটু যা উন্নাসিক। তারাও ওঁকে এড়িয়ে চলত। আবও বড় যাঁরা—তাঁরা ওঁকে তোয়াজ ক'রে কথা বলতেন। সাহেবের কাছে কোন কাজ আদায়ের ব্যাপার থাকলে—আলতোভাবে মেমসাহেবকে খুশী করার চেষ্টা করতেন। সব মিলিয়ে মেমসাহেব—সুচরিতা চক্রবর্তী—তখন একটি প্রসিদ্ধ নাম।

যা ভয় করেছিলেন তাই। প্রথম বলটাই হাঁকড়ালো কল্যাণ—ওভাব বাউণ্ডারী। বলটা ওঁর মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে, কাঁটা তারের বেড়া টপ্‌কে, বাগানের মধ্যে বেলগাছটাব গায়ে লেগে—একেবারে তির্যক-গতিতে 'বোঁ' ক'রে সেই 'বাঘের-ঘরের' পেছন দিকের খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে উধাও। অভ্যাস মতই বলের পেছনে ছুটে ছিলেন। কাঁটা তারের বেড়াও টপ্‌কে ছিলেন, কিন্তু বাংলোর পেছন-দবজার তিনটি সিঁড়ির দু'ধাপ উঠেই ওঁকে থামতে হয়েছিল। 'ঢুকবেন? কি ঢুকবেন না?' ভেবে ঠিক করতে সময় লেগেছিল ওঁর। সাহসে ভর ক'রে শেষ সিঁড়িটাও উঠেছিলেন, একপা একপা ক'রে ঢুকেও ছিলেন বাংলোর ভেতরের লম্বা দালানটার মধ্যে। বলটা চোখে পড়েনি। তার বদলে কানে এসেছিল—মৃদু 'খুট্‌খুট্' শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা।

লম্বা দালানের পাশের একটা দরজা খুলে গিয়েছিল—বোধহয় ওটা 'স্নানের ঘর'। একটা রঙিন তোয়ালে কোমরের নিচে থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত জড়ানো। তার ওপরের আর নিচের অংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। পায়ে পাতলা কাঠের খড়ম—হলুদ রঙের।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ। আলতো ক'রে মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে

নিয়েছিলেন, তাকিয়ে থাকতে পারেননি সেদিকে। 'খুট্‌খুট্‌' শব্দটা ওঁর কাছে এগিয়ে এসেছিল। উনি তাকিয়ে ছিলেন সেই খড়মের দিকেই। কাছে, একেবারে কাছে। তারপর থেমে গিয়েছিল ওঁর কাছটিতে এসে। "কী চাই ?"—প্রশ্নটা কানে এসেছিল ওঁর, জবাব দিতে পারেন নি। "কী চাই তোমার ?" এবারে স্বরটা নরম। শুধু দু'টি অক্ষরই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন উনি—"বল"। "বল ? কোথায় বল ?"—'বাঘিনীর' স্বরে কৌতুক। এবারে উনি একটুখানি তুলেছিলেন মুখটা। চোখে পড়েছিল—ধব্‌ধবে সাদা অনাবৃত বুক, ছোট ক'রে ছাঁটা একরাশ চুলের কিছুটা কাঁধের ওপর ছড়িয়ে ; সরু কোমরের নিচে থেকে গোলাপী তোয়ালে, গভীর নাভি। হাঁটুর নিচে থেকে—পা দু'টি কি সরস্বতী ঠাকুরের ?

ভিজে ভিজে একখানা হাত ওঁর কাঁধের পাশে গলায় ঠেকে ছিল। শুনতে পেয়েছিলেন—কানের কাছটিতে মুখ এনে খুব আস্তে ক'রে বলা কথা ক'টি—"কোন্‌ বলটা নেবে ? উঁ ?" উনি জবাব দিতে পারেন নি। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। পায়েও যেন জোর ছিল না। ঘাম্‌ছিলেন কি সেই শীতেও ?

হঠাৎ মৃদু আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। পরক্ষণেই ওঁর মুখটা—সাদা, নরম, যেন দুটো মাখনের তালের মধ্যে চেপে ব'সে গিয়েছিল। দু'টো চোখের ওপর অনুভব করেছিলেন নরম ছোঁয়ার চেপে-ধরা। নাকে একটা সুন্দর গন্ধ। গন্ধটা ওঁর খুবই চেনা—'হোয়াইট্‌ রোজ ভিনোলিয়া'। আরও ছোটবেলায় 'মায়ের' গায়ে অবিনাশ এই গন্ধটাই পেতেন।

বলে কী !

মাত্র একটি লাইন লিখেছি—শশধর ঘরে ঢুকেই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। "কী লিখছো ভায়া ? কবিতা নাকি ?"—ব'লেই প'ড়ে ফেল্‌ল লাইনটা—'যেখানেই তুমি দুর্বোধ্য সেখানেই তোমার সফলতা'। "এতো দেখছি আধুনিক কবিতার বিষয়ে 'আধুনিক কবিতা' লিখছো।" —মন্তব্য করল শশধর। "তার মানে ?"—প্রশ্ন করি। বিজ্ঞের মত ভাব ক'রে বলে শশধর—"তুমি ভায়া এতকাল কবিতা লেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো—আর ও মার-প্যাঁচটুকু বোঝনা বলতে চাও ?"—না বুঝেই বিস্ময় প্রকাশ করি। বোঝাবার চেষ্টায় উঠে প'ড়ে লেগে যায় শশধর। "মানে মিলের কবিতা লেখার চেষ্টায় মাথা খুঁড়ে রক্তপাত ঘটবার পর জন্মলাভ করল 'ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স'। সেটাও ভূমিষ্ঠ হওয়া যখন কঠিন হয়ে উঠল—গর্ভপাতের পরিণতি ঐ আধুনিক কবিতা। অতএব প্রতি ছত্রেই যতটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে ততই তো তার সফলতা।" আমি বিস্ময়ে হতবাক—বলে কী ! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে।

আমার নীরবতাই বোধ হয় তাকে উৎসাহিত করল, তাই ব'লেই চল্‌ল। প্রতিটি কথায়, প্রতিটি মন্তব্যে যেন এক একটি নতুন আবিষ্কার প্রকাশ ক'রে যাচ্ছে এমনি ভাব। টেবিল চাপ্‌ড়ে বলে শশধর—"লিখুক দেখি তোমাদের কোন আধুনিক কবি একটি পুরোনো ঢঙের 'মিল'-এর কবিতা। সারারাত ধ'রে মাথার চুল ছিঁড়ে যদি বা লাইন চারেকও বার হয়, তা হবে নেহাতই 'যা-পদ্য-মিলে-যা' গোছের। তাই, অত ঝামেলায় কাজ কি বাবা, লেখা যাক্‌না আধুনিক কবিতা নামে কবিতার গর্ভস্রাব।"

উঠে যাব কিনা ভাবছি, হাতটা চেপে ধ'রে, বসিয়ে রেখে

বক্তৃতা চালিয়ে যায় শশধর—"এই ধরোনা আধুনিক চিত্রকলার কথা। সেদিন ঝোঁকের মাথায়—ঠিক ঝোঁকের মাথায় নয়, প্রাণের দায়েই বলতে পার—একটি বন্ধুর সঙ্গে (মানে কিছু টাকা ধার পাবার সম্ভাবনা ছিল তাই) তোমাদের ঐ য়্যাকাডেমী অফ্ ফাইন্ আর্টস্ না কি আছে—সেখানে এক আধুনিক শিল্পীর আধুনিকতম চিত্র প্রদর্শনী দেখতে যেতে হয়েছিল। দেখি, সবান্ধব, থুড়ি, সবান্ধবী শিল্পী নিজেই দর্শকদের আপ্যায়ন করছেন। দর্শকদের মধ্যে যারা কিছু 'অর্বাচীন'—তাদের এক একটি ছবির 'বক্তব্য'-ও বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে চলেছেন। একটা ছবিতে দেখি—'মাটিতে একটি লাঠি পোঁতা, তার উপরে একটা মস্ত বড় মাটির তাল।' সেটি দেখিয়ে শিল্পী এক অতি উৎসাহী সমঝদারকে বোঝালেন—ওটা নাকি 'স্বাস্থ্যের' প্রতীক। আমাকে অবাক দেখে, একটু অবজ্ঞার সুরেই বললেন—মানে, আধুনিক স্বাস্থ্যের। বেশি অবাক হলে আশপাশের দর্শকরা বোকা ভাববে, তাই বেবাক নির্বাক হয়ে রইলাম।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের আশাতেই বলে উঠ্লুম—"আমিও বিশেষ কিছু বুঝি না ও ব্যাপারে।" উলটো ফল হল। আরো জোর দিয়ে বলে উঠল শশধর—"আরে, বুঝবে না-ইতো, বুঝলে তো আর আর্ট হল না। মানে আসল ব্যাপারটা কি জান? আগেকার শিল্পীরা যেমন-জিনিষের ছবি আঁকতেন ঠিক তেমনটি করার চেষ্টাই করতেন। কেউ ঠিক ঠিক পারতেন, কেউবা একটু ঊনিশ-বিশ ক'রে ফেলতেন। তারপর যখন ফটোগ্রাফীর যুগ এল, এবং আলোকচিত্রের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হল, তখন ছবি-আঁকা শিল্পীরা প'ড়ে গেলেন ফাঁপরে। যতই সফল হোন না কেন, ঠিক আলোকচিত্রের মত হুবহু চিত্র তো আর বার হোল না কারো হাত থেকে—মানে তুলি থেকে। তাই তাঁরা সকলে মিলে ঠিক করলেন—ঠিক জিনিষটা ঠিকমত ক'রে আঁকা চলবে না। তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল বেঠিক ভাবে আঁকার প্রতিযোগিতা, এবং

তারই নাম দেওয়া হল—'আধুনিক চিত্রকলা', এবং সে-ও যেখানে যতটা দুর্বোধ্য—ততটাই সফল।"

একসঙ্গে এতগুলো 'এবং'-এর ধাক্কা সামলানো শক্ত। ভয়ে ভয়ে শুধোই—"তা, আমার কাছে এসব প্রসঙ্গ কেন ভাই?" জবাবে বলে ওঠে—অম্লান বদনে শশধর—"কেন, তুমি যে ঐ লিখছিলে—'যেখানেই তুমি দুর্বোধ্য সেখানেই তোমার সফলতা', এ কথা আর আধুনিক কবিতা ছাড়া কোন্ বিষয়ে লিখবে ভায়া? তুমি একটু-আধটু সাহিত্য করো—জানা আছে কিনা। তা, আমাকে গোটা পনেরো টাকা ধার দিতে পারো? পরশুই ফেরৎ পাবে।"

অতীতেও অমন অনেক 'পরশুই' পার হয়ে গেছে মনে পড়া সত্বেও—রেহাই পাবার রাস্তা খুঁজি পনেরটি টাকা 'ধার' দিয়ে।

তাৎক্ষণিক

যত জোর দিয়েই বলিনা কেন—সত্যিকারের একটা সত্যি ঘটনা লিখতে বসেছি—বিশ্বাস করবে না কেউ। তাই, সে চেষ্টা না ক'রে লিখেই ফেলি ঘটনাটা।

গত বছর, ১৯১০ সালের মে মাসে, বেনারস যাচ্ছি ডুন এক্সপ্রেসে। একলাই যাচ্ছি। থ্রি-টিয়ারের একটা ওপরের বার্থে আমার ঠাঁই হয়েছে। আমার সামনা-সামনি ওপরের বার্থটিতে একটি তরুণী—সালোয়ার-পাঞ্জাবী পরা। প্রথমে বাঙ্গালী মেয়ে বলে মনে হয়নি—পরে বুঝলাম ভুল করেছি। আমার ঠিক নিচের বার্থে মেয়েটির বাবা—বয়েস বছর পঞ্চাশেক। তার নিচের বার্থে মেয়েটির মা—মাঝারী বয়েসের ছিমছাম চেহারা। মেয়েটির নিচের বার্থে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক, তার নিচের বার্থে—মনে হয় তাঁর স্ত্রী—বর্ষিয়সী।

হাওড়া স্টেশনেই—সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছিলাম। দূর-পাল্লার ট্রেনে কোথাও যেতে হলে একটি ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের বই আমার চাইই-চাই। স্টেশনের বুক-স্টল্ থেকে তাই একটি সংগ্রহ করেছিলাম। ট্রেনে উঠে সহযাত্রীদের বেডিং-বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলির ভিড়ে, এবং তরুণী মেয়েটির ছট্‌ফটানির দাপটে, পরনের প্যাণ্টুল ছেড়ে, লুঙ্গিটি প'রে একটু 'ফ্রি' হয়ে নেওয়ার মতলব ত্যাগ করতে হয়েছিল। দারুণ গরম। গাড়ীর পাখাগুলো দেখে ভাবতে হয়—'তুমি কি কেবলই ছবি'? তাই কেবল গায়ের সার্টটি খুলে—প্যাণ্ট-গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই ওপরের বার্থে উঠে—শয্যা বিছোতে হল—মাথার দিকটায় ছোট্ট য়্যাটাচিটি এবং মোজা সমেত জুতোজোড়া লুকিয়ে রেখে।

ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পটা বেশ জমে উঠেছে। নিচের ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন—"আলোটা নেভানো যায় না?" মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব

দিল—"যাবে না কেন ? এখানে লেখা-পড়া চলছে যে।" পত্রপাঠ পাঠ বন্ধ, বই বন্ধ। ভদ্রলোক আলো নেভালেন। নাইট-ল্যাম্পটির কাঁচ সাদা—তাই যথেষ্ট অন্ধকার হল না। তবু, পাশ ফিরে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—বেনারস পৌঁছে—পরপর কোন্ কোন্ কর্ম কি ভাবে সেরে—কত তাড়াতাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা যায়। হঠাৎ.........

হঠাৎ চারিদিকে সমবেত গুঞ্জন---সারা কামরায়। ওপাশের দিক থেকে হুংকার, ভয়ার্ত চিৎকার, আমাদের এদিকে কেমন যেন—সামাল সামাল ভাব সব। দেখতে হল ব্যাপারটা কি। কয়েক সেকেণ্ডেই পরিষ্কার হল—ট্রেনে ডাকাত উঠেছে। পরে জেনেছিলাম দলে তারা ছিল ছ'জন। দু'জনের হাতে ভোজালি, একজনের হাতে একটা দেশী পাইপগান, দু'জনের হাতে পিস্তল, একজনের হাতে—মনে হয় সেই দলপতি—মোটা একগাছা দড়ি—যা দিয়ে বন্ধনের কাজও চলে—যুৎ ক'বে ধ'রে তা দিয়ে পেটানোও চলে। ওরা সারা কামরায় ছড়িয়ে পড়লো। চারজন নাকি ওদিকটায় কাজ হাসিল কবছিল, আমাদের দিকে এগিয়ে এল দু'জন। একজনের হাতে চক্‌চকে ভোজালি, অন্যজনের হাতে একটি ছোট্ট পিস্তল। উঠতে গিয়েও শুয়ে পড়লাম। সামনের সেই মেয়েটির দিকে চোখ পড়লো। ভয়ে সে যতটা জড়সড়—তার চেয়ে বেশি কৌতুক তার চোখ দু'টোয়—যেন একটা মজার ব্যাপার ঘটতে চলেছে। আমার দু'হাতের দু'আঙুলে—দামী পাথর বসানো দু'টো সোনার আংটি ছিল। সন্তর্পণে সে দু'টি খুলে ফেলে চালান ক'রে দিতে যাচ্ছি—মাথার কাছে লুকিয়ে রাখা জুতোর মধ্যে—মেয়েটির গলা থেকে বিদ্রূপের স্বর—"বীরপুরুষ।" আর যায় কোথা ? মন্ত্রের মত কাজ হল—হিতাহিত ভুলে গেলাম। যে কর্মের জন্য অন্যকে হাজার বার আহাম্মক বলতাম—ঠিক সেই কর্মটি করার জন্য মনটা চন্‌মন করতে লাগলো। ভোজালি হাতে ছেলেটি (থুড়ি, ডাকাতটি) আমার বিপরীত দিকের মাঝখানের বার্থের

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের ভুঁড়িতে ভোজালির ডগাটি ঠেকিয়ে ভারী গলায় হুকুম করল—"কি কি আছে বার কর্ জল্‌দি।" মনে হল যেন একটু চাপও দিল ভোজালির। ভদ্রলোক—'রাম-জী' কথাটি উচ্চারণ করা ছাড়া আর যা করতে লাগলেন—তা হল, ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপা।

পিস্তল হাতে ডাকাতটি মেয়েটির দিকে এগিয়ে এল। এক ঝলক তাকে দেখে নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখোমুখি হল। কড়া ভাষায় হুকুম করল,—"টাকা-কড়ি, ঘড়ি, আংটি, বোতাম—যা যা আছে ছাড়ো জল্‌দি। এক মিনিট দেরি করলে মাথার খুলিটা উড়ে যাবে।" আমি তখনও শুয়ে। কড়া একটি ধমক খেয়ে উঠে বসতে হল। প্রথমে-পাওয়া ভয়টা ততক্ষণে কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন উবে গেছে। স্থান-কাল-পাত্রও যেন স্বাভাবিক অনুভূতির বাইরে। অল্প পরিসরের মধ্যে কোন রকমে উঠে বসতে গিয়ে পা দু'টো নিচের দিকে ঝোলাতে হল। ডান পায়ের হাঁটুতে পিস্তলের নলটা দিয়ে একটা ঠোক্কর মেরে, ডাকাত ছেলেটি বলল—"কী হল? কি কি আছে ছাড়ো না ঝট্‌পট্। এক মিনিট সময় দিলাম—তারপরই খতম।" প্যাণ্টের হিপ-পকেট থেকে ছোট্ট মানি-ব্যাগটা বার ক'রে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম—তাতে যে বেশি টাকা নেই তা আমার জানাই ছিল। আসল টাকা-কড়ি সবই য়্যাটাচিটির মধ্যে—বার্থের একপাশে রাখা। হাত বাড়িয়ে মানি-ব্যাগটি যেই নিতে গেছে ডাকাতটি—দু'দিকের দুই বার্থের লোহার 'পাটি' দু'টি দু'হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে শরীরটা ঝুলিয়ে নিয়ে জোড়া-পায়ে লাথি কষালাম—তার বুকের ঠিক মাঝখানটিতে। ছিট্‌কে সে প'ড়ে গেল কিছুটা দূরে। পড়ল গিয়ে ঠিক তার অপর দোস্তটির ঘাড়ের ওপর। সেও টাল-সামলাতে না পেরে প'ড়ে গেল গাড়ীর মেঝেতে। প্রথম ডাকাতটির পিস্তলটি ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল—নিচের বার্থে শুয়ে থাকা মাড়োয়ারী গিন্নির পাহাড়-প্রমাণ কাপড়-চোপড়ের মধ্যে। দ্বিতীয় ডাকাতটির হাতের ভোজালিটি মাটিতে

পড়বার আগে প্রথম জনের হাঁটুর নিচেটা চিরে দিয়ে গেল। দু'জনেই চিৎকার ক'রে উঠলো। আর চিৎকার ক'রে উঠলো—আমাদের দিকের প্রায় প্রতিটি যাত্রী—"ডাকাত ধরা প'ড়েছে, ডাকাত ধরা প'ড়েছে।" ধরা তারা মোটেই প'ড়েনি—মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছে দু'জনেই। আবার দু'হাতে দু'দিকের বার্থের লোহার পাটি দু'টি শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে—জোড়া পায়ে দড়াম ক'রে লাথি,—দু'জনেই জড়াজড়ি ক'রে চলনপথের ওপারের বেঞ্চের উপর ব'সে কাঁপতে-থাকা এক বৃদ্ধার ঘাড়ের ওপর আছড়ে পড়ল। ইতিমধ্যে এদিকের দু'একজনের বুদ্ধি খুলে গেল—তারস্বরে সকলে চিৎকার করতে লাগলো—"এ দু'টো ঘায়েল হয়েছে, এবার ওদিকেরগুলোকে পাকড়াও।" ওদিকে ঠিক কি ঘটছে বোঝা যাচ্ছিল না, কেবল মাঝেমাঝে আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ গাড়ীর গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল মাঠের মাঝখানে। কেউ চেন টেনেছে। বাইরে 'ঝপ-ঝপ' শব্দ পাওয়া গেল। পরে জানা গিয়েছিল—ওদিকের ডাকাতদের তিনজন গতিক স্থবিধের নয় মনে ক'রে ঝপাঝপ্ লাফিয়ে প'ড়ে পগার পার। যার হাতে মোটা দড়িটা ছিল, সে ছিল মাঝামাঝি জায়গায়—আমাদের কাছাকাছি। সে একবার এদিকের দুই সঙ্গীর দশা ছাখে, আর একবার ওদিকের তিন সঙ্গীর পলায়নের বহর ছাখে। তারপর বুদ্ধি ক'রে হাতের দড়িটার প্রান্ত দু'টি ধ'রে—মাঝখানটা ছুঁড়ে দেয়—সঙ্গী দু'টিকে টিপ ক'রে—ঐ ভাবে তাদের টেনে বার করবার মতলবে। দড়িটা প'ড়ে ছিল ঠিকই, তবে ওদের দুর্ভাগ্য—পড়লো সেটা ওর দুই সঙ্গীকে টপ্‌কে—একজন যাত্রীর ট্রাঙ্কের ওপরঁ। তারপর দড়িতে টান দিতেই—ট্রাঙ্কটির পাশের হাতলে আটকে গিয়ে—সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ভাল করতে গিয়ে মন্দ ক'রে ফেলল—সেই দড়ি-হাতে দলপতিটি। আশপাশের যাত্রীরা দড়িটা ধ'রে ফেলে ওদের তিনজনকেই জড়িয়ে ফেললো সোপাটে।

একটু পরেই গার্ডসাহেব এলেন, এলেন পুলিসের পোষাকধারী

দু'জন। হৈ-হল্লা—কী হল ? কি ক'রে হল ? কার কি খোয়া গেছে, কে কতটা আহত হয়েছে, কে ধরল ডাকাতদের, কীভাবে ? —ইত্যাদি সমবেত প্রশ্ন এবং সমস্বরে উত্তর। আমি তখন আবার সেই ডিটেকটিভ গল্পে মন দেবার চেষ্টা করছি—লক্ষ্মী ছেলেটির মত শুয়ে শুয়ে। এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে—আর যাই হোক—আগামী-কালকের বেনারসে আমার অতি অবশ্য করণীয় জরুরী কাজটি যে পণ্ড হবে—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ।

সামনের মেয়েটি এতক্ষণ বসে বসে দেখছিল ব্যাপারটা। এবার আবার একবার বলল—'বীরপুরুষ।' তবে, এবারের স্বরটা আলাদা রকমের। আমি উল্টো দিকে মুখ ক'রে শুলাম—হাতে বইটি। ততক্ষণে সিভাল্‌রির মোহ কেটে গেছে। ওসব 'তাৎক্ষণিক' ব্যাপারের পরমায়ু কতটুকু ?

"চোরটা"

হঠাৎ চোখ পড়ে যায় বিনতার—হঠাৎই চোখে পড়ে যায়। কলটা খুলে দিয়ে দু'হাতের আঁজলা ভ'রে জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিয়ে সাবানের ফেনা ধুয়ে ফেল্‌তে ফেল্‌তে—মুখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ে যায়—কলঘরের দরজার মাঝ বরাবর—বুক ভর উঁচুতে ছোট্ট ফুটোটা। দেখে অবাক হয় বিনতা। নিজের শরীরের দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন লজ্জায় পড়ে যায়— বন্ধ-দ্বার কলঘরের মধ্যেও। চানের সময়ে শরীরে এক ফালি কাপড় থাকলেও চান ক'রে কেমন যেন তৃপ্তি পায় না সে। নর্দমার কাছ বরাবর মেঝেতে পড়ে থাকা ছোট্ট সাবানের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের চাপে দরজার সেই ছোট্ট ফুটোটা বন্ধ ক'রে দেয় বিনতা। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। চান সেরে নেয়—ফুটোটা ওখানে কি ক'রে হল— ভাবতে ভাবতে।

পরের দিন দুপুরে কলঘরে চান করতে ঢুকেই মনে পড়ে যায়—গতকাল-দেখা, আর সাবানের টুকরো দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া দরজার ফুটোটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তাকায় দরজার দিকে। অবাক কাণ্ড। ফুটোটা ঠিক আগের দিনের মতই খোলা। কাছে এগিয়ে গিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখে সে বাইরেটা,—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভেতরটা তাহলে তো ভালই দেখা যাবে—কেউ যদি বাইরে থেকে দেখবার চেষ্টা করে, বিশেষ ক'রে সে যখন চান করে—এবং তার অভ্যাস মত গা-খোলা অবস্থায়। আবার সাবানের টুকরো দিয়ে বুজিয়ে দেয় সে গর্তটা। তবুও চান করতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে বিনতা। ফুটোটা হলই বা কি ক'রে এবং গতকাল বুজিয়ে দেবার পর আবার কেমন ক'রে তৈরী হল ফুটোটা—ঠিক আগের মতই! আপনা থেকে তো হওয়ার কথা নয়। কেউ নিশ্চয়ই বানিয়েছে ফুটোটা—এবং ইচ্ছে ক'রেই—মতলব নিয়েই। এবং গতকালকার সেই সাবানের টুকরোটা পরিষ্কার ক'রে আবার বানিয়ে নিয়েছে ফুটোটা আগের মতই।

কিন্তু কেন ? এবং কে করতে পারে এমন কাজ ? এই 'কেন'-র জবাব তার মাথায় একটা এসে যায়। তা হচ্ছে—কলঘরের ভেতরটা দেখা—ফুটোটার মধ্যে দিয়ে—চুরি ক'রে। প্রয়োজন ? ভাবতেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সে। কিন্তু কে করলো ? কে করতে পারে ? তার স্বামী বিনায়ক ? অসম্ভব। এমনিতেই ফিরে তাকাবার সময় নেই তার। তায় আবার চুরি ক'রে দেখতে যাবে—এতকাণ্ড ক'রে ! তবে ? গৃহভৃত্য বিশু ? বয়েসটা তার খারাপই বটে, তবে এতটা সাহস তার হবে বলে মনে হয়না। এই তিনটি প্রাণী নিয়েই তো তার সংসার। তাহলে ? এই 'তাহলে' ভাবতে গিয়ে রাঙা হয়ে ওঠে বিনতা। বিমলেন্দু ! ফের লাল হয়ে ওঠে তার মুখ-চোখ—বোধহয় সারা অঙ্গটাই। আজ তিনদিন হল বোলপুর থেকে এসেছে বিমলেন্দু। গত বছরেও এই সময়টা এসেছিল তাদের দু'জনের অনেক অনুরোধে। তিন-চার দিনের বেশী থাকতে পারে নি—থাকতে চায়নি। এবারেও তারা দু'জনেই অনেক অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখেছিল তাকে —এখানে আসবার জন্যে। একা একা থাকা, এই দূর-বিদেশে, একটা কথা-বলার লোক পর্যন্ত নেই। আসুক না সে কয়েকটা দিনের জন্যে। পরপর কয়েকটা চিঠি পেয়ে—এসেছে শেষ পর্যন্ত বিমলেন্দু। চার দিন এখানে থেকেই চলে যাওয়ার কথা। গতকাল রাতেই তারা স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় বায়না জুড়ে দিয়েছিল—আরও কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে হবে, এই অনুরোধ নিয়ে। হয়তো থেকেও যাবে কয়েকটা দিন—অনুরোধ এড়াতে না পেরে। বিনায়ককে 'দাদা' ব'লে ডাকে—সেই সুবাদে বিনতা 'বৌদি'। ছেলেটি ভাল, ভদ্র, লেখা-পড়ার চর্চা আছে। কাজকর্ম করে। বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানগম্যি আছে—কথা ব'লে আনন্দ পাওয়া যায়। এক রকম আত্মীয় বা বন্ধুই হয়ে গেছে সে এ সংসারের। একটু স্বভাব-গম্ভীর যদিও, রসবোধ আছে যথেষ্টই। একটু মিশলেই বোঝা যায়—নির্ভর করা চলে এর ওপরে। সে কিনা করবে—এমন

কাজ ! ভাবাই যায় না। আবারও লাল হয়ে ওঠে বিনতা—লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে। মনের মধ্যে যতই তোলা-পাড়া করে প্রসঙ্গটা—ততই যেন কেমন 'বোকা বোকা' মনে হয় নিজেকে। কাউকে তো বলাও চলে না, বিনায়ককেও নয়। কী ভাববেন তিনি ? ওকেই হয়তো 'ছোট' ভাববেন।

পরের দিন—যথা পূর্বং ! চানের সময় দরজায় সেই ফুটোটা—আরও প্রকট, আরও পরিষ্কার। চান না ক'রে—অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে ভাবে বিনতা—সম্ভাব্য সকল কথা, অসম্ভাব্য অনেক কথাও। অনেকক্ষণ ধ'রে চান করে বিনতা,—বেলা গড়িয়ে যায়।

বিনায়ক অফিসে চলে গেছে—সকাল ন'টায়। চাকরটা একটু আগেই বাজারে গেছে—টুকিটাকি এটা-ওটা কেনাকাটা করতে। বিমলেন্দুকে তো বাইরের ঘরে একখানা শারদীয়া সংখ্যা কামড়ে প'ড়ে থাকতে দেখে এসেছে একটু আগেই। এখনকি সে উঠে এসে দাঁড়িয়ে গেছে—কলঘরের দরজার পাশটিতে ? হঠাৎ খুলে দেখবে নাকি দরজাটা—বিনতা ? দেখে চমকে দেবে, লজ্জা পাইয়ে দেবে— চোরটাকে ? নাঃ, থাক।

আবারও বন্ধ ক'রে দিয়ে আসে গর্তটা—সাবানের টুকরো দিয়ে—ধীরে-সুস্থে চান সেরে নিয়ে। কলঘরের বাইরে এসে ছ্যাখে—চাকরটা ফিরেছে বাজার থেকে, বিমলেন্দু একই ভাবে প'ড়ে আছে পত্রিকা নিয়ে। দুষ্টু। কত মন পড়ায় ! জানতে যেন বাকী নেই বিনতার।

বিশুর জন্যে খাবার আলাদা ক'রে রেখে—দু'জনের জন্যে ভাত বাড়ে বিনতা—তার নিজের আর বিমলেন্দুর—পরিপাটি ক'রে। বাইরের ঘরে এসে ডাকে বিমলেন্দুকে—"কি গো ভাল ছেলে, ক্ষিদে তেষ্টা কি আছে ? না ঐতেই পেট ভরবে ?" মুখ তুলে তাকায় বিমলেন্দু। বলে—"দারুণ জমেছে, বৌদি"। তা-তো বুঝতেই পারছি, অসভ্য কোথাকার—মনে মনে বলে

বিনতা। দু'জনে এক সাথে খেতে বসে। খেতে খেতে কথা ব'লে যায় বিমলেন্দু। বিনতা শুনে যায় একমনে। লক্ষ্য ক'রে যায় তাকে। তার কথা বলার ভঙ্গী, মুখ-তুলে তাকাবার ধরন, —খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ছাখে। কেমন যেন নতুন নতুন লাগে। খাওয়ার পর বিমলেন্দু আবার পত্রিকা নিয়ে পড়ে। বিনতা আর থাকতে পারে না তার সামনে। শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মনে মনে ব্যাপারটা বারবার পর্যালোচনা করে। কেমন যেন একটা চাপা লজ্জা, একটা কাঁপা কাঁপা আনন্দ। দূর, আনন্দ হতে যাবে কেন? অসভ্যটার শাস্তি হওয়া উচিত। ব'লে দেবে নাকি বিনায়ককে?

মন-স্থির করতে পারে না বিনতা—পরের দিন সকাল পর্যন্তও। হঠাৎ তার সখ হয় গোয়েন্দাগিরি করার। দেখতে হবে কখন ও ফুটোটা বানায় এবং কিভাবে? সকালেই একবার দেখে এসেছে ফুটোটা—বন্ধ আছে ঠিকই, আগের দিনের সাবানের টুকরোটা দিয়ে। বিনায়ক চান সেরে খেতে বসতেই বিমলেন্দু চান ক'রে নিয়েছে—রোজকার মত। বিনায়ক কাজে বেরিয়ে গেলেই—ফুটোটা আবার বানিয়ে রাখতে যে যেতেই হবে—ওদিকে বাছাধনকে, একথা তো জানাই আছে বিনতার। বিনতা চান করতে ঢোকে রোজই বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ, অর্থাৎ ঐটুকু সময়ের ফাঁকে ফুটোটা বানানো হয় রোজই। আবারও একবার দেখে আসে বিনতা—ফুটোটা ঠিক বন্ধ আছে কিনা। মাঝখানের এই ঘণ্টা খানেক সময় সতর্ক থাকতে হবে তাকে—চোখ রাখতে হবে কখন চুপিসাড়ে চোর ঢোকে! হাতে-নাতে ধ'রে ফেলতে হবে চোরটাকে। ধ'রতে পারলে না একবার, এমন শাস্তি দেবে সে তাকে! দুষ্টুটা যা কল্পনাও করতে পারবে না।

কাজের অছিলায় রান্না ঘরে ব্যস্ত থাকে বিনতা। চোখ রাখে কিন্তু কলঘরে যাবার পথের ওপর। কই গেল না তো একবারও ওদিকে বিমলেন্দু, সেই সকাল থেকেই তো বই মুখে ক'রে বসে

আছে বাইরের ঘরে। যাদু-টাদু তো আর জানে না, যেতে হবেই একবার নিশ্চয়, এবং এখনই এই সাড়ে এগারটার আগেই।

এগারটা বাজল, আর ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারে না বিনতা। বাইরের ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দেয় সে। মনটা যেন ব'লে ওঠে 'কই, ওঠো।' হতাশ হয়ে কলঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বিনতা। গর্তটা এখনও বন্ধ আছে আগের মতই। তবে কি আন্দাজ পেয়ে গেছে বিমলেন্দু যে গোয়েন্দা লেগেছে—চোর ধরবার জন্যে। এগারটা দশ,—পনের। এখান থেকে সামনের হলের দেওয়াল ঘড়িটা বেশ দেখা যায়। ···এগারটা কুড়ি।

হঠাৎ, 'বোঁ-ওঁ-ওঁ', বোঁ-ওঁ ক'রে একটা মৃদু শব্দ। একটা উড়ন্ত পোকা। ছোট্ট, সরু, লম্বাটে, রং-চঙে। উড়ে এসে বসে কলঘরের দরজার ওপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে সেই বুজিয়ে দেওয়া ফুটোটার দিকে। মুখের সামনের ছোট ছোট শুঁড় দু'টো দিয়ে বার কয়েক ছুঁয়ে দেখে গর্তটাকে। তারপর মাথা চালিয়ে দেয় গর্তটার মধ্যে। সাবানের ছিপিটা যায় খুলে, পরিষ্কার হয়ে যায় ফুটোটা—আগের দিন যেমনটি দেখেছিল বিনতা। 'বন্ধদ্বার' কলঘরের ভেতরে ঢুকে যায় পোকাটা। বিনতাও এগিয়ে যায় যন্ত্র-চালিতের মত। কলঘরের মধ্যে চ'লে আসে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে খোঁজ করে আসামীকে। ছাদের নিচে এক কোণে মাটি দিয়ে একটা বাসা বানাচ্ছে পোকাটা একমনে। কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এখন সেই ঘর-বাঁধার কাজে ব্যস্ত সে।

মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্-ঝিম্ ক'রে ওঠে বিনতার। কল-ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তার ওপরই মাথাটা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে সে অনেকক্ষণ। কলটা খুলে—মাথায়, কানের পাশে জল চাপ্‌ড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে বিনতা। একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে—দীর্ঘশ্বাসের মত শোনায়।

‘প্রতিবন্ধী’

“সবিনয় নিবেদন,”

বাঃ, বেশ বিনয়ী তো ছেলেটি—প’ড়েই ভাবলেন বিনয়বাবু। কানায় কানায় ভর্তি চায়ের কাপটি সাবধানে হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন স্ত্রী—মমতাময়ী। কাপ থেকে প্লেটে এক ফোঁটা চা প’ড়ে গেলে—সে চা আর খান্ না স্বনামধন্য শিল্পপতি ‘বিবিবি’—অর্থাৎ ‘বিনয়ভূষণ বসু’ মহাশয়। তাই এই বাড়তি সাবধানতা।

চায়ের কাপটি সামনে ধ’রে দিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন মমতাময়ী—“কি গো আজ ক’খানা এল ?” “আজ ছ’খানা”—জবাব দেন বিনয়বাবু। বলেন—“সবে প্রথমটি খুলেছি—পড়া হয়নি এখনও।”

ব্যাপারটা মমতাময়ীর ঠিক পছন্দ নয়। মাঝে মাঝেই তাই মন্তব্য করেন—“কাগজের ‘পাত্তর’ ভাল হয় না বাপু।” বিনয়বাবু কান দেন না সে কথায়। ক’দিন ধ’রে তাই যে ক’টি চিঠি এসেছে তাঁর বিজ্ঞাপনের জবাবে—সযত্নে রেখে দিয়েছেন—ঝাড়াই বাছাই করবার জন্যে। মতলব—আরও কয়েকটা দিন দেখে—লেখালেখি শুরু করবেন। একমাত্র মেয়ে তাঁর, একমাত্র সন্তান। ভাল ক’রে দেখে শুনে দিতে হবে তো। শুধু তো মেয়ের ভবিষ্যতই নয়, তাঁকেও হয়তো নির্ভর করতে হতে পারে ভবিষ্যতে।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটি দিয়েই—আবার পড়তে শুরু করেন তিনি—আজকের সেই প্রথম চিঠিটি।

“সবিনয় নিবেদন,

“মহাশয়, আমি একজন প্রতিবন্ধী। প্রকৃত অর্থেই প্রতিবন্ধী।” ব্যাপারটা কি ? ঠিক বুঝতে পারেন না বিনয়বাবু। ‘প্রতিবন্ধী’ পাত্রও আবেদন জানিয়েছে নাকি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার। অবাক হন তিনি, একটু বিরক্তও। চিঠিটি বাতিল ক’রে—

'বাতিলের' দলেই রাখতে যাচ্ছিলেন। কী ভেবে যেন—ফের পড়তে শুরু করেন।

"আমি কানা, খোঁড়া বা কুঁজো নই। হাত এবং পা আমার ভালই চলে, হয়তো একটু বেশি ভালই চলে। মাথায় আমার কোন গোলমাল নেই। অবিশ্যি এই চিঠিটি লেখবার সত্যিকারের প্রয়োজনটি যদি আপনাদেরকে বুঝিয়ে উঠতে না পারি—তাহলে হয়তো আপনাদের সন্দেহ জাগতে পারে।

"আমি গত চার বছর আগে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে ভাল ভাবে বি. এ. পাশ করেছিলাম। শরীর স্বাস্থ্য—আপনাদের পাঁচজনের শুভেচ্ছায়—ভালই। তবু আমি একজন প্রতিবন্ধী, প্রকৃত অর্থেই প্রতিবন্ধী। যারা চোখে দেখতে পায় না, বা কানে শুনতে পায় না, অথবা কথা বলতে পারে না (বা এর কোনটাই পারে না), অথবা যারা ভাবনা-চিন্তার ধারে কাছেই যায় না, অর্থাৎ ঐ কর্মটির 'যন্তর'-ই যাদের বিকল—তাদের থেকে অনেক গুণে বেশী প্রতিবন্ধী আমি।

"আমার রুজি-রোজগারের কোন ব্যবস্থা নেই, নেই কোন রাস্তা। হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা, বা মস্তিষ্কের ব্যাপারে কোন রকম ঘাটতি থাকলে—সেটাই হয়তো আমার পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারতো। সরকারী সহানুভূতি, সাহায্য পাবার একটা রাস্তা হয়তো তাতে খোলা পাওয়া যেতে পারতো। নিদেন-পক্ষে সেই প্রতিবন্ধকতাটুকু ব্যবহার ক'রে যৎকিঞ্চিত রোজগারের ব্যবস্থাও ক'রে ফেলতে পারতাম। তালিকা-ভুক্ত কোন জাতি বা উপজাতির সদস্য হলে—সেই তথাকথিত সামাজিক প্রতিবন্ধ-কতাও কাজ দিত।

"কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য—ঐসব তুচ্ছ তুচ্ছ প্রতিবন্ধকতার কোনটাই আমার নেই। আমি তাই আজ একেবারে সত্যি-কারের একজন 'প্রতিবন্ধী'।"

পড়তে পড়তে পড়া থামিয়ে—মুখ তুলে একবার তাকিয়ে

ছ্যাখেন বিনয়বাবু। স্ত্রী মমতাময়ী—সাগ্রহে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। ভাবেন—এতদিনে হয়তো মনোমত 'পাত্তর' একটি পাওয়া যেতে চলেছে।

চায়ের কাপে পরপর কয়েকটি চুমুক দিয়ে—আবার পড়তে শুরু করেন বিনয়বাবু।

"কয়েক শ' দরখাস্ত করেছি চাকরীর জন্যে। বার দু'য়েক প্রায় পেয়েই গিয়েছিলাম। শেষে বাধ সাধলো—ঐ প্রতিবন্ধী 'সংরক্ষণের' ব্যাপারটা। হল না। চাকরীর ক্ষেত্রে—অবসর-প্রাপ্ত সামরিক কর্মী, তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি, এবং ইদানিং কালে—প্রতিবন্ধীদের জন্যে স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা—আমাদের মত যাদের ঐ সব গুণাবলীর কোনটাই নেই—তাদের পক্ষে যে নতুন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে—তা ঠেকিয়ে—চাকরী সংগ্রহ করতে পারাটা একটি—'নীল-চন্দ্রের' ঘটনা বললেই চলে। চাপরাসী-পিওনের চাকরী—একটি ব্যাঙ্কে প্রায় হয়েই গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে বাধ সাধলো—'বেশী লেখাপড়া।' অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে আমার সাধের গ্র্যাজুয়েসন-ই হল 'প্রতিবন্ধকতা'! ব্যবসা? ও যাদের আছে, তাদেরই হয়। বেশ ভাল ক'রে চিন্তা-ভাবনা ক'রে 'স্কিম' বানিয়ে—টাকার ব্যাপারে এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ধরা-ধরি ক'রে প্রায় ম্যানেজ ক'রে ফেলেছিলাম। ছোট্ট সুন্দর একটি কারখানা আমার—যেন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে জানা গেল—তাঁর পূর্বসূরী—অর্থাৎ আগের ম্যানেজার-বাবুটি রিটায়ার করেছেন—অথচ অনেক লেখালেখি, ঘোরাঘুরি ক'রেও—তাঁর পাওনা গ্র্যাচ্যুইটির টাকাটা পাচ্ছেন না। কারণ, তিনি এখানে যে শ'দুয়েক ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন—তার শতকরা আশিটি ক্ষেত্রেই নাকি টাকা ফেরত আসছে না। অতএব? বর্তমান ম্যানেজার-বাবুটি 'শ্যেকি' হয়ে পড়েছেন। হল না। অথচ, মনে হচ্ছে—ছোট-খাট একটি কারখানা বানাতে পারলে—ভাল চাকরীর চেয়ে অনেক গুণে ভাল হত। মনের মধ্যে বেশ জোর

পাচ্ছিলাম—আমার প্ল্যানমত একটি কারখানা—আমি ভালভাবেই চালাতে পারতাম।

"তাই বলছিলাম—আমার থেকে 'প্রকৃত প্রতিবন্ধী' আর কে আছে? আপনাদের বহুল-প্রচারিত দৈনিক পত্রে যদি আমার এই প্রতিবন্ধকতার বিষয় একটু লেখালেখি করেন, একটু আলোচনা করেন—কত যে ভাল লাগবে—কী বলব। বুঝব—কিছু হোক আর না হোক—আমাদের সমস্যাটি অন্ততঃ একটি বারের জন্যেও আলোচিত হল।

"নিবেদন ইতি—

ভবদীয়—

শ্রী অপ্রকাশ মিত্র

তাং—৫।৩।৮১ ৫২, সুদর্শন চন্দ্র ষ্টীট, কোন্নগর, হুগলী।"

চায়ের কাপটিতে শেষ চুমুকটি দিয়ে—স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকান বিনয়বাবু। তারপর আবার একবার পড়তে শুরু করেন চিঠিখানি—মন দিয়ে। অন্য পাঁচখানি চিঠি আর খোলাই হয় না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন বিনয়বাবু। মমতাময়ী জানতে চান—চিঠিটির মর্মার্থ। বিনয়বাবু প্রকাশ ক'রেই বলেন—"এটা আমাদেরকে লেখা চিঠি নয়। কাগজের সম্পাদককে লেখা এই চিঠিটি—কিভাবে যেন আমাদের 'বক্সে' এসে গেছে।"

বিনয়বাবু—এই প্রথম—কাগজে কলম ঠেকান—এ ব্যাপারে। নির্বাচনের কাজ তাঁর সমাপ্ত।

নীহারিকা

মাথার ওপর পাখাটা বন্ বন্ ক'রে ঘুরছিল। ঘুরছিল প্রকাশের মাথাটাও। শুধু মাথাটাই নয়, মাথার মধ্যে যেন একটা নীহারিকা আবর্ত, ঘুরছিল ঠিক সেই অনুপাতেই। ব্যাপারটা যতই তলিয়ে দেখছে সে, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। বিমূঢ় হয়ে পড়ছে। একটা মানুষের 'নাম', শুধুমাত্র 'নাম'-ই যে এমন অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে—তা ওর কল্পনার বাইরে। তবু, ব্যাপারটা যে ঠিক কী ঘটেছিল—তা তো ওর কাছে এখন জলের মতই পরিষ্কার।

আসলে, ঐ একই ব্যাপার ওর জীবনের গতিপথও কীভাবে যে ভিন্নমুখী ক'রে দিল—তা এখন ওর মাথাতেই আসছে না। বি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে কি সে একবারও ভেবেছিল—এই তিন বছরের মধ্যে ওর পুলিশের চাকরী, লাফিয়ে উন্নতি সাব-ইনস্পেক্টরের পদে, এবং সেই সঙ্গে এই ক্রিমিন্যাল-অধ্যুসিত থানায় পোস্টিং হয়ে যাবে! এখন তো সে একজন ঘোরতর রকমের দুঁদে পুলিশ অফিসার, এবং কৃতী সি. আই. ডি. অফিসার ব'লে পরিচিত—পুলিশ মহলেও।

নিজের টেবিলে ব'সে, চেয়ারটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে, পা দুটো সামনে ছড়িয়ে হেলান দিয়ে ব'সে ও ভাবতে থাকে অবাক হয়ে গত তিন বছরের ওর নিজের কার্যকলাপ। ওর জীবনের ঐ 'মোড়' নেওয়ার ঘটনাটা গোড়া থেকে পর্যালোচনা করে প্রকাশ—নিজের চেম্বারে, নিজের চেয়ারে ব'সে ব'সে—এই প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে একা একা।

বি. এস. সি. পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ভাল ফলই আশা করছে ও। এখন হাতে প্রচুর সময়, তারপর এম. এস. সি.-র ভাবনা। রবিবার সকালে যাবার কথা দেওয়া ছিল ওর—দেবেশদের বাড়ী বরানগরে। বাবা হঠাৎ একটা কাজের দায়িত্ব চাপালেন ওর

ঘাড়ে রবিবার সকালের জন্যেই। তাই, আগের দিন শনিবার বিকেলেই ও চলে গেল দেবেশদের বাড়ী। মাসীমা—দেবেশের মা, ওকে খুবই স্নেহ করেন। ও যে দেবেশের বলতে গেলে একমাত্র অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দেবেশের বোন ক্লাশ ইলেভেনে পড়ে। প্রকাশ গেলেই মাসীমা তাকে অঙ্ক নিয়ে বসিয়ে দেন ওর কাছে। প্রকাশ অঙ্কে নাকি চৌখস; এদিকে নমিতার মাথায় আর সবই ঢোকে সহজে, কেবল ঐ অঙ্কটি ছাড়া। দেবেশ এসে মুক্তিদাতার ভূমিকা না নিলে কোনদিনই ও রেহাই পায় না নমিতাকে অঙ্ক বোঝানোর হাত থেকে। দেবেশের বাবা সাধারণতঃ বাড়ী থাকেন না। চাকরী ছাড়াও একটু আধটু 'সাহিত্য' করেন। 'বই-পাড়ায়' যাতায়াত তাঁর ঘনঘন।

যা কোনদিনই দেখেনি প্রকাশ, আজ তাই দেখল। বাড়ীর সদর দরজা 'হাট' ক'রে খোলা। বাড়ীটা ওদের বড়রাস্তা থেকে একটু দূরেই। একটা পায়ে-হাঁটা পথ বড়রাস্তা থেকে সোজা ওদের সদর দরজায় শেষ হয়েছে। দু'পাশে ছোট ছোট আগাছা আর কচু গাছের ঝোপ। কলিং বেলটা আর বাজাতে হলনা—ও ভেতরে ঢুকে গেল। সামনেই একটা ঝুলন্ত লোহার খাঁচায় একটা চন্দনা পাখী—কেউ বাড়ী ঢুকলেই 'কে' 'কে' বলে চিৎকার করত। আজ দেখল, তাকে খাঁচার ওপর বসে থাকতে। খাঁচার দরজাটাও 'হাট' ক'রে খোলা—বাড়ীর সদর দরজাটির মত। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে পাখিটাকে ধ'রে খাঁচার মধ্যে পুরে দেবার মতলবে ও গুটি গুটি হেঁটে কাছে যেতেই পাখিটা উড়ে গিয়ে বাড়ীর উঠোনের পেঁপে গাছটার ওপর বসল। ও চিৎকার ক'রে দেবেশের নাম ধরে ডাকল, সাড়া পেলনা। বার কয়েক ডেকে কারো সাড়া না পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল—নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে।

সামনের বারান্দাটা পার হয়ে প্রকাশ যেই বড় ঘরটায় ঢুকেছে, প্রথমেই চোখে পড়ল দেবেশের প্রিয় কুকুর লালুর

দেহটা। তার পাশেই একটা বড় শতরঞ্জির ওপর পাশাপাশি—দেবেশ, নমিতা, মাসীমা আর মেসোমশাই শুয়ে আছেন—অস্বাভাবিকভাবে। ও আবার ডাক দিল দেবেশের নাম ধরে, একটু জোরেই। কারো সাড়া নেই। ওর যেন কেমন সন্দেহ হল। ভালো ক'রে তাকিয়ে ছ্যাখে, তাদের সবাইকার দেহই—তার-জড়ানো—ইলেকট্রিকের 'নেকেড্' তার। ও ছুটে গিয়ে প্লাগটা খুলে দিল। যদিও তার আর দরকার ছিল না। ওরা সব অনেক-ক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। ইলেকট্রিকও ফিউজ হয়ে গেছে। প্রকাশের বেশ মনে পড়ে, ও তখনই ছুটেছিল কাছের পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ নিয়ে মিনিট পনেরর মধ্যে ফিরে এসে ছ্যাখে, বাড়ীর ঠিকে-ঝি হাঁউ মাঁউ ক'রে বেরিয়ে আসছে বাড়ী থেকে—পাগলের মত অবস্থা তার। পুলিশ দেখে কিছুটা থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে পাশ কাটিয়ে পালাতে যায় সে। অফিসারটি হাত উঁচু ক'রে বাধা দিয়ে তাকে সকলের সঙ্গে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে বাধ্য করেন।

ঠিক আগেকার চিত্রটিই আবার দেখতে হল প্রকাশকে। পুলিশ অফিসাররা ঘরময় চলাফেরা করলেন, বাড়ীময় ঘোরাফেরা করলেন, শেষে স্বগতোক্তি করলেন—"এ সিম্পল কেস অফ্ ম্যাস স্যুইসাইড্। তবুও আমাদের যথাবিধি ব্যবস্থা নিতে হবে।" দু'জন কন্স্টেবলকে পাহারায় বসিয়ে রেখে প্রকাশকে আর সেই ঠিকে ঝি-টিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের গাড়ীতেই থানায় নিয়ে গেলেন। ওদের দু'জনের জবানবন্দীর ঝক্কি মিটতে রাত প্রায় আটটা হল। থানার বড়বাবু ইতিমধ্যে এসে পড়লেন। সবিস্তারে ঘটনাটি শুনেই তিনিও একবার অকুস্থলে যেতে চাই-লেন। প্রকাশ আবার সঙ্গ নিল, তিনি কোন আপত্তি করলেন না। 'ঝি'-মেয়েটি ছাড়া পেয়ে, এবং তার বর্ত্তমান ঠিকানা ছেড়ে কোথাও যাবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে, প্রায় দৌড়েই পালাল। যেন ভূতে তাড়া করেছে—এমনি ভাব তার।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে ঐ ঘরের সারকিটের ফিউজ-ওয়্যার পাল্‌টে, আলো জ্বালিয়ে ঘরটা তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করলেন দারোগা সাহেব। প্রকাশকেও এটা ওটা আবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কিছু কিছু কাগজ-পত্তর, দু'একটা ফাইল, দু'একটা বই—যা নাকি ওর 'মেসোমশায়ের'-ই ছদ্মনামে লেখা, কয়েকটা ফটো—দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে এবং আরও কয়েকটা না-বাঁধানো ফটো—একটা ট্রাঙ্ক থেকে বার ক'রে—সব নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে। মালগুলির দু'কপি লিস্ট বানিয়ে প্রকাশের, এবং ইতিমধ্যে এসে পড়া পাশের বাড়ীর সুবল নন্দী নামে এক ভদ্রলোকের সই করিয়েও নিলেন। একটা না-বাঁধানো ফটো—সামনের খোলা দেরাজেই পাওয়া গেল। অনেক কালের পুরনো ভেবে দারোগা সাহেব সেটা ঘরের এক পাশে ফেলে দিলেন। প্রকাশ সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর কাঁধের ঝোলা ব্যাগটিতে রেখে দিল—দারোগা সাহেবের অলক্ষ্যে। দেবেশদের কোন জিনিসই এখন অবজ্ঞার নয়—এমনি মনের ভাব তখন প্রকাশের। কুকুরটা সমেত পাঁচটি মৃতদেহই মর্গে চালান করার ব্যবস্থা করা হল ময়না তদন্তের জন্যে। বাড়ীটিতে পুলিশ পাহারা বহাল রইল। অনেক রাতে সেদিন বাড়ী ফিরেছিল প্রকাশ। কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়েছিল—মায়ের পীড়াপীড়ি অগ্রাহ্য ক'রে। কাউকে কিছু বলেনি সেদিন।

ওরা কিভাবে খবর পায় কে জানে! পরেরদিন সকালেই ঐ সমবেত আত্মহত্যার কাহিনী ছেপে বার হল দৈনিক পত্রিকাগুলিতে—যদিও সঠিক খবর প্রায় ছিলই না কোন কাগজেই। কাগজে প'ড়ে প্রকাশ সবিস্তারে ঘটনাটি শুনিয়েছিল মাকে। বল্লেছিল, ঐ দৃশ্য দেখে আর ঐ পুলিশী ঝামেলা সামলে গতকাল রাতে তার আর খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। মনের অবস্থাও খুবই খারাপ ছিল। বলেছিল—"দেবেশ, তার মা, বাবা, বোন—কারোর মুখেই যন্ত্রণার ছাপ ছিল না মা, যেন নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে সব। কী আশ্চর্য ব্যাপার বলতো!" মা দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, আর ওকে সাবধান ক'রে

দিয়েছিলেন—ও-নিয়ে বেশী মাথা যেন না ঘামায় প্রকাশ, পুলিশে ছুঁলে 'ছত্রিশ ঘা'।

পর পর ক'দিনের কাগজেই ব্যাপাটার বিষয়ে অনেক গালগল্প ছাপা হল। সে সব প'ড়ে, এবং রোজ দু'বেলা সেই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারটির সঙ্গে দেখা ক'রে প্রকাশ বুঝে গিয়েছিল—ওদের দ্বারা সম্ভব হবে না ঘটনাটির রহস্য ভেদ করা। তাছাড়া—তাগিদ দেবার মত লোকও ছিল না একটাও—কেবল প্রকাশ ছাড়া। আর তার সম্পর্কই বা কতটুকু ঘনিষ্ঠ ওদের সঙ্গে যে জোর ক'রে কিছু বলবে পুলিশকে। এমনি ক'রে পুরো একটা মাস কেটে গেল। একদিন ভোর হবার আগেই প্রকাশের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ওর ঐ ঘটনাটির কথা, আর মনে হল, পুলিশ কিছু না করতে পারুক—ওর তো অন্ততঃ চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত ছিল—কী রহস্য আছে ওই নিদারুণ ঘটনাটির পেছনে—যাতে ক'রে বাড়ীর প্রতিটি প্রাণীকে স্বেচ্ছায় জীবন দিতে হল। ঐভাবে আত্মহত্যা করতে ওদের মধ্যে কারও কোনও আপত্তি ছিল—একথাও মনে করা অসম্ভব হয়েছিল—ঐ মৃতদেহগুলির অবস্থা দেখে। দেখে যেন মনে হয়েছিল—ওরা যেন অনেক ভাবনা চিন্তা ক'রেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়—অন্য কোন উপায় নেই ধরে নিয়েই। অথচ তার মাত্র তিন দিন আগেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে দেবেশের। কার্জন পার্কে ব'সে সন্ধের পর অবধি ওরা গল্প করেছে চিনেবাদাম খেতে খেতে। তখন তো দেবেশকে বেশ হাসি-খুশিই মনে হয়েছিল ওর। কে কি বিষয় নিয়ে এম. এস. সি. পড়বে সে বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছিল। আলোচনা হয়েছিল—অনেক দূর-ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা ক'রে। কথায় কথায় একথাও উঠেছিল—বি. এ. পাস করার আগে মা তো নমিতার বিয়ে কিছুতেই দেবে না স্থির ক'রে রেখেছে। ক'দিন আগে মায়ের এক পাড়ার-বন্ধু তাঁর ভাসুর-পোর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করতে চাইছিলেন। ছেলেটি

ইঞ্জিনিয়র—রাউরকেল্লায় ভাল কাজ করে। মা কিন্তু অটল, এখন ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, অন্ততঃ বি. এ. পাস না করা পর্যন্ত। এত কথা হল সেদিন দেবেশের সঙ্গে, আর এরই মধ্যে ঐ মাত্র তিনটি দিনের মধ্যেই কী এমন ঘটল যে, এইভাবে এতগুলি অমূল্য জীবন নষ্ট করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না! সেদিন বেশীক্ষণ বসতে চায়নি দেবেশ। বলেছিল, বাবা তার কালনা গেছেন, রাতে বাড়ী নাও ফিরতে পারেন, তাই ওর বেশী দেরী করা চলে না—মা হয়তো চিন্তা করছেন। প্রকাশ জানতে চেয়েছিল—কালনায় কেন গেছেন তার বাবা? এই তো ক'দিন আগে তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন বলছিলি। নতুন গল্পের প্লট সংগ্রহ করতে নাকি? দেবেশ সহজ সুরেই বলেছিল—যাবার কারণ জানেনা সে।

প্রকাশের মনে পড়ল—পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ আলাপ জমে গেছে প্রকাশের। তিনি নিজে বেশী সময় দিতে না পারলেও—প্রকাশের ব্যগ্রতার তিনি সমর্থক। তিনি ওকে তাঁর 'ফাইল' পড়তে দিয়েছেন, যা যা ইতিমধ্যে জেনেছে পুলিশ—সবই ওকে জানিয়েছেন অকপটে। মন্তব্য করেছিলেন—ওটা একটা সমবেত মনোবিকারের ব্যাপার। ও-নিয়ে বেশী মাথা যেন ও না ঘামায়। ঠিক মানতে পারেনি প্রকাশ। ওর কেবলই মনে হয়েছে—এমন একটি নিদারুণ রহস্য আছে ব্যাপারটির মধ্যে—যেটা ওদের মতো মার্জিত রুচির লোকেদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। নিজেদেরকে পৃথিবী থেকে লুপ্ত ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথই দেখতে পাননি তাঁরা—তাঁদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী।

পুলিশের কাছ থেকেই নাম-ঠিকানা পেয়ে প্রকাশ একদিন সোজা চলে গেল সেই অফিসে যেখানে কাজ করতেন দেবেশের বাবা। বড়বাবু—প্রথমেই ওর পরিচয় জানতে চাইলেন, জানতে চাইলেন—ওর কোন আত্মীয়তা আছে কিনা ধরবাবুর সঙ্গে। ঐ

'ধরবাবু' নামেই যে দেবেশের বাবা পরিচিত ছিলেন তাঁর অফিসে— তা বোঝা গেল। ছেলে-ছোকরারা তো বটেই, এমন কি যে-কয়েকজন মাত্র পুরনো কর্মচারী আছেন—তাঁরাও ওঁর পুরো নাম কখনো ব্যবহার করতেন না, সকলেই তাঁকে 'ধরবাবু' বলেই ডাকতেন। এসব অবশ্য প্রথমেই বোঝেনি প্রকাশ, বুঝেছিল ওখানে দু-তিনদিন যাতায়াত করার পর।

বড়বাবু বললেন—"বড্ডই 'স্যাড্' ব্যাপার ভাই। আমি তো কাগজে দেখেই চমকে উঠেছিলুম। সোমবার অফিসে এসে শুনলুম, বিপিনবাবু—যিনি ধরবাবুর সঙ্গে সব থেকে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন— ছুটেছিলেন তাঁর বাড়ী রবিবার সকালে কাগজে খবরটা দেখেই। সোমবার অবিশ্যি কয়েকজন স্টাফ্ গিয়েছিলেন। আমার আবার বাতের প্রকোপ, কোন রকমে অফিসটা করছি। তা ওরা কেউই ঢুকতে পায়নি বাড়ীতে। পুলিশের নাকি কড়া পাহারা। আর তা তো হবেই, এমন একটা অভাবনীয় ঘটনা। আত্মীয়-স্বজন বোধ হয় কেউ নেই ওঁদের। 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড', 'গ্র্যাচুয়িটি' ইত্যাদি ছাড়াও এ-মাসের একুশ দিনের মাইনে—সবই তো পাওনা। ক্লেমেণ্ট নেই কেউ। তাই প্রথমেই ভাই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম— কোনরকম আত্মীয়তা আছে কিনা তোমার ওঁদের সঙ্গে।" —এক-নাগাড়ে কথা বলে গেলেন বড়বাবুটি। প্রকাশ যখন বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইল, তখন তিনি সোৎসাহে বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি কিছু বলতে পারেন, তো ঐ বিপিনবাবুই পারবেন হয়তো। তাছাড়া যা 'রাশভারী' লোক ছিলেন ধরবাবু! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর চাকরী করলেন আমাদের সঙ্গে—কখনও একটি বাড়তি কথা বার হয়নি মুখ দিয়ে। তাছাড়া সাহিত্যিক মানুষ, আমরাও একটু খাতিরই করতুম।"

বিপিনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে প্রকাশ। তিনিই নাকি ধরবাবুর সব থেকে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবু বললেন—"কি জান ভায়া, ধরবাবু লোকটি চিরকালই দুর্বোধ্য। কোন কথা, কোন বিষয়েই কিছু

বলতে চাইতেন না। মুখে কথাটি ছিল না। ছোকরারা তো আড়ালে বলতোই—মুখে 'মিটার' বসানো আছে ধরবাবুর। তবু এতকাল মেলামেশা থেকে যেটুকু জেনেছি নিশ্চয়ই বলব তোমাকে।" প্রকাশকে বলতেই হয়—তাইতেই হবে। বিপিনবাবুর বক্তব্য থেকে জানা গেল—ধরবাবু তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সাল নাগাদ কলকাতায় প্রথম আসেন পড়তে। তারপর, পরের বছরই একবার মাত্র দেশে গিয়েছিলেন—যশোরে। কলকাতার নেবুতলার একটা মেসে থাকতেন—পড়তেন, বিদ্যাসাগর কলেজে। তারপর 'রায়ট্', দেশ ভাগ। বাবা-মা, ছোট্ট বোনটি একেবারে না-পাত্তা। অনেক কষ্টে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য নিয়ে একবার মাত্র যেতে পেরেছিলেন যশোরে —পার্টিশনের পর। গিয়ে নাকি শুনেছিলেন, ওঁদের গ্রামে বিশেষ হাঙ্গামা হয়নি। তবু, ভয়েই নাকি ওঁব বাবা—ওঁর মা আর ছোট বোনটিকে নিয়ে বাড়ী ছেড়েছিলেন—এপারে পালিয়ে আসবার জন্যে। সঙ্গে নাকি টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি সবই আনছিলেন। বর্ডার অবধি নাকি আসতেও পেরেছিলেন। তারপর আব কোন পাত্তা নেই। সব মিলিয়ে ধরবাবুর ধারণা জন্মেছিল—তাঁরা সকলেই মারা পড়েছেন। ওখান থেকে উনি চলে যান নারায়ণগঞ্জে। সেখানে ওঁর দূর-সম্পর্কের এক মেসোমশাই থাকতেন—যাঁদের ধরবাবু ভাল ক'রে চিনতেনও না। সেখানে গিয়েও খোঁজ ক'রে জেনেছিলেন—তাঁরাও নাকি না-পাত্তা। অবিশ্যি সেখানে খুবই গোলমাল হয়েছিল সে-সময়ে। পাকিস্তান থেকে ফিরে ধরবাবু নাকি অন্ততঃ পাঁচ-ছ' বছর বাবা-মা বোনের খোঁজ করেছিলেন কলকাতায়। এখানে চাকরীতে ঢুকেও মাঝে মাঝেই উধাও হতেন—তাঁদের খোঁজে। কিন্তু সবই বৃথা। শেষমেষ উনি ধরে নিতে বাধ্য হলেন—তাঁরা সবাই নিহত হয়েছেন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসবার পথে। সেই থেকে, ধরবাবু একেবারে 'গুম্'। হাসতে তো তাঁকে কেউ দেখেনি বললেই চলে। সারাদিন মুখ গুঁজে কাজ করতেন। অবসর পেলে কি-যেন সব লিখতেন। তা, তার অর্ধেকই প্রায়

ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। একটু থেমে বিপিনবাবু যেন দম নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন। "ওঁর লেখা যে ক'টি গল্পের বই আছে—সব অবিশ্যি আমার পড়া হ'য়ে ওঠেনি—প'ড়ে দেখতে পারো ভায়া, হয়তো কোন হদিশ মিললেও মিলতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিলনা, অন্ততঃ একবারও কারো কথা শুনিনি তাঁর কাছে।" প্রকাশ জিজ্ঞাসা করে—"বিয়ে? বিয়ে করলেন কবে এবং কোথায়? সে তরফের কেউই কি নেই তাঁর?" বিপিনবাবু এবারে যেন একটু ভাবিত হ'য়ে পড়েন। বলেন—"বিয়ে বোধ হয় করেছিলেন '৫৮/'৫৯ সালে। সেটাও হঠাৎ, এবং প্রায় গোপনেই। অর্থাৎ, আমরা কেউই জানতে পারিনি। জেনেছিলাম অনেক পরে—তা প্রায় বছর চারেক পরে, যখন ওঁর ছেলে হ'ল। একদিন টিফিনের সময় হঠাৎ আমাকে একটা রাজভোগ খাওয়ালেন। অনেক জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল—'গতকাল'ই তাঁর প্রথম সন্তান—একটি পুত্র, ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেইদিনই ভায়া, কথাবার্তার মধ্যে জেনেছিলাম, মাত্র তিন দিনের ছুটি নিয়ে তিনি বিয়ে ক'রে ফেলেছিলেন—প্রায় হঠাৎই। আমাদের অফিসে একটি বৃদ্ধ পিয়ন কাজ করত। কালনার লোক, হপ্তায় একদিন বাড়ী যেত। ফিরে এলেই দেখতাম, ধরবাবুর সঙ্গে একান্তে যেন কী বিষয়ে আলাপ করছে। পরে জেনেছিলাম, তারই মধ্যস্থতায় ধরবাবু কালনায় বিয়ে করেছেন। তবে, সেখানে তাঁর যাতায়াত ছিল বলে শুনিনি।" "শ্বশুরমশাই বা বাড়ীর কারো নাম-ঠিকানা জানতে পারেননি?"—জিজ্ঞেস করে প্রকাশ। জবাবে বিপিনবাবু বলেন—"সেই পিয়ন ব্রজেনের কাছে শুনেছিলাম, কালনার শ্মশানঘাটের কাছে ধরবাবুর শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুরমশাইয়ের নাম যতদূর মনে পড়ছে—মনতোষ না মনোমোহন ঘোষ। ঠিক মনে করতে পারছি না ভায়া।" প্রকাশকে এবারে উঠতে হয়। বলে—"আজ চলি দাদা, ফের আসব কিন্তু একটু বিরক্ত করতে মাঝে মাঝে।" "কী যে বল ভায়া, বিরক্তি কিসের? তুমি এলে তো

তবু ধরবাবুর বিষয়ে একটু আলোচনা হয়। কি জান ভায়া—লোকটি ছিলেন একটি মূর্তিমান হেঁয়ালী। তবু কেন কে জানে, তাঁকে যেন একটু শ্রদ্ধাই করতাম। খুব 'আপ-রাইট্' ছিলেন কিনা।”

প্রকাশ যেন ক্রমশঃ একজন ডিটেক্‌টিভ্ ব'নে যাচ্ছিল নিজের অজান্তে। ঘন ঘন সে দেখা করতে লাগল বরানগর থানার মিঃ ভাদুড়ীর সংগে—সেই অফিসারটি—যাঁর ওপর ঐ কেসটির দায়িত্ব। তিনি এবং বড়বাবু মিঃ সামন্ত—দু'জনই ওকে বেশ দরদের সংগে সাহায্য করতেন। মিঃ ভাদুড়ীর সংগে পরামর্শ ক'রে প্রকাশ আবার একদিন গেলো দেবেশের বাবার অফিসে। বড়বাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধরবাবুর সার্ভিস রেকর্ড থেকে তাঁর কলকাতাব ঠিকানা, ঠিকানা পরিবর্তন এবং আদি বাসস্থানের ঠিকানা, এমনকি তাঁর বাবাব নাম—সবই জোগাড় ক'রে ফেলল। কলকাতার ঠিকানা—প্রথমে নেবুতলার মেস, তারপর বাগবাজার এবং সবশেষে বরানগর, অর্থাৎ যেখানে থাকতে প্রকাশ দেখে আসছে। যশোরে উকিল পাড়ায় নাকি তাঁদের আদি বাড়ী ছিল। বাবার নাম অম্বিকা ধর।

মিঃ সামন্তকে ভজিয়ে লালবাজার থেকে অনুমতি আদায় ক'রে প্রকাশ মিঃ ভাদুড়ীর সংগে চলে গেল যশোরে। সেখানে উকিল পাড়ায় অনেক খোঁজা-খুঁজি ক'রেও অম্বিকা ধর নামে কারো সন্ধান বা অতীত অস্তিত্ব জানা গেল না। দু'একজন প্রবীণ ব্যক্তি জানালেন—'অম্বিকা চৌধুরী' ব'লে এক ভদ্রলোক ওখানে বাস করতেন বটে, তবে তাঁরা তো বহুকাল দেশছাড়া। তাঁদের বসত বাড়ীতে এখন আবদুল খালেক নামে একজন গভর্ণমেণ্ট অফিসার বাস করেন। একজন বললেন—শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আছেন এখনো—যিনি অম্বিকা চৌধুরীর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। খোঁজ করলে তাঁর কাছে হয়তো কোন সংবাদ পাওয়াও যেতে পারে।

বেশী খুঁজতে হ'ল না। শ্যামসুন্দরবাবুকে পাওয়া গেল। বৃদ্ধ, খুবই বৃদ্ধ। চোখে দেখতে পান না, কানে কম শোনেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল—অশ্বিনীকুমার ধরচৌধুরী নামে একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক বহুকাল আগে ওখানে বাস করতেন। শ্যামসুন্দরবাবু তাঁর গৃহদেবতার সেবা করতেন, এবং তাঁর খুবই অনুগত ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র—অম্বিকাচরণ। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর পৈত্রিক পদবী 'ধর-চৌধুরী' ব্যবহার করতেন না। শুধু 'চৌধুরী' লিখতেন। এইটুকু বলে ভদ্রলোক চুপ করলেন। প্রকাশ জানতে চাইল—তাঁরা গেলেন কোথা? এবং পরিবারে কে কে ছিলেন? অনেক ভেবেচিন্তে শ্যামসুন্দরবাবু যা বললেন—তার মর্মার্থ হল—অম্বিকাচরণের স্ত্রী ছাড়া একমাত্র পুত্র—নাম যতদূর মনে পড়ে—'শক্তি' বলেই ডাকত সবাই, এবং একটি শিশুকন্যা—নাম মনে পড়ে না—এই ছিল সংসার অম্বিকাচরণের। শক্তি—যতদূর মনে পড়ে—তাঁর থেকে বিশ-পঁচিশ বছরের মত ছোট ছিল বয়েসে। তাকে তার বাবা কলকাতা পাঠিয়ে ছিলেন—কলেজে পড়তে। তারপর আর কোন খবর জানেন না তিনি।

"আর অম্বিকাবাবুদের কি হল?"—জানতে চায় প্রকাশ। "তারা তো ভাই সব পালাল এখান থেকে—ছেচল্লিশের রায়েটের সময়—সংগে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে। তারপর আর জানা যায়নি কিছু তাদের বিষয়ে। কেউ বলে কলকাতা চলে গেছে, কেউ বা বলে—পথেই মারা পড়েছে সব। যা আগুন জ্বলছিল সে সময়ে সারা দেশে।" বৃদ্ধ ভদ্রলোক আপশোষ করলেন। প্রকাশ না-ছোড়-বান্দা। ও আবার প্রশ্ন করে—"অম্বিকাবাবুর আর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না? তাঁদের কোন খবর যদি জানা থাকে আপনার……।" আর বলতে হল না। বৃদ্ধ বলে উঠলেন—"ছিল, ছিল একটি দূর-সম্পর্কের বোন — অম্বিকাচরণের স্ত্রীর। ওদের বাড়ীতেই বলতে গেলে মানুষ। নাম ছিল—শান্তি। বয়েসে আমার চেয়ে অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট ছিল সে। ভারী সুন্দরী

ছিল। অথচ এমন ভাগ্য দেখ তার—যথেষ্ট দেখেশুনেই ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন তার ভগ্নীপতি—অম্বিকাচরণ। কিন্তু হ'লে কি হবে, সবই ভায়া বিধিলিপি—বরটি তার পাঁড় মাতাল। দেনার দায়ে এখান থেকে পালিয়ে—বউ নিয়ে উঠল গিয়ে নারায়ণগঞ্জের শাঁখারীপাড়ায়। শুনেছি একটি নাকি ছেলেও হয়েছিল তার। কিন্তু সেই যে গেল তারা—আর এমুখো হয়নি। তা, সে অন্ততঃ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এখন তারা কেউ বেঁচে আছে কিনা কে জানে? আর থাকলেও, কোথায় আছে, কেমন আছে তাই বা কে জানে!" অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি অম্বিকাবাবুর সেই ভগ্নীপতিটির নাম মনে করতে পারলেন না। শুধু বললেন—কুলীন ঘোষ বংশের ছেলে ছিল সে। ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয় প্রকাশ আর মিঃ ভাদুড়ী। প্রকাশ জেদ ধরে—নারায়ণগঞ্জে গিয়ে অম্বিকাচরণের সেই শ্যালিকাটির বা তাঁর পরিবারের খোঁজ নিতে হবে। মিঃ ভাদুড়ী কিন্তু কিছুতেই রাজী হন না, বরং বাধাই দেন। বলেন—"এখানে এসে অবধি অন্ততঃ বার তিনেক এখানকার থানায় গেছি আমরা। কোনরকমের সহানুভূতি বা সহযোগিতার গন্ধ পেয়েছেন পুলিশের কাছে? ওরা যেন আমাদের তাড়াতে পারলেই বাঁচে। হয়তো বা ভাবছে আমরা পুলিশের ছদ্মবেশে গুপ্তচর। আর আপনার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, ভারত সরকারের সুপারিশ না থাকলে গ্রেপ্তারই ক'রে বসত আপনাকে। আর, তাছাড়া আমাদের শুধু যশোরে আসবার পারমিশানই আছে। নারায়ণগঞ্জে যেতে হ'লে আবার নতুন ক'রে লেখালেখি করতে হবে। তাতে ঝামেলা এবং সময় দুই-ই"...... এতটা বলে মিঃ ভাদুড়ী চুপ করলেন,—প্রকাশের মুখের এবং মনের অবস্থা আঁচ ক'রে দেখতে চাইলেন। অগত্যা প্রকাশকে বলতেই হল—"তাহলে একবার ঐ আবদুল খালেকের সংগে মোলাকাৎ করা যাক চলুন। যদি কোন সূত্র প্যাওয়া যায়।" মিঃ ভাদুড়ী অপ্রসন্ন হলেও, আপত্তি জানালেন না,

যেহেতু খালেকের বাস ঐ যশোর শহরেই এবং সংবাদ যদি সত্যি হয়—তো চৌধুরীদের ঐ আদি বাড়ীতেই। তবে মিঃ ভাদুড়ী অবাক হন প্রকাশের প্রস্তাবে, কারণ দেবেশের বা তার বাবার কোন সম্পর্কের হদিশই তিনি পাননি এখানে কোথাও।

পরেরদিন সকাল সকালই মিঃ ভাদুড়ী আর প্রকাশ ঠিকানা খোঁজ ক'রে দেখা করল মহঃ আবদুল খালেকের সংগে। তিনি প্রায় আধঘণ্টা বসিয়ে রেখে, দয়া ক'রেই যেন দর্শন দিলেন ওদের। মিঃ ভাদুড়ী যখন বললেন—"এই বাড়ীটা তো আগে অম্বিকা চৌধুরীর ছিল, তাঁদের সংবাদ কি কিছু পাওয়া যাবে আপনার কাছে?" তিনি যেন হঠাৎই চ'টে উঠলেন। বললেন—"কে আপনার অম্বিকা চৌধুরী আমি জানি না। এ বাসা আমাকে সরকার থেকে 'য়্যালট্' করা হয়েছে। আপনাদের যদি কিছু জানবার থাকে, থানায় গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।" তিনি ওদের পত্রপাঠ বিদায় করতেই চাইলেন। প্রকাশ এবার মিষ্টি ক'রে কথা ব'লে খালেক সাহেবকে একটু নরম ক'রে নেবার চেষ্টা করল। বলল—"না-না, তা'নয়, আপনি তো এখানকার পুরনো বাসিন্দা, এবং খুবই নামজাদা লোক বলেই শুনলাম, যদি কিছু জানা থাকে—চৌধুরী ফ্যামিলির অথবা ধর চৌধুরী ফ্যামিলির সম্বন্ধে। আমাদের কলকাতা থেকে আসবার একমাত্র কারণ কেবল ঐ ফ্যামিলির বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, আর কিছু নয়। অন্ততঃ তাঁদের বাড়ী বা কোন সম্পত্তির ব্যাপারে তো নয়ই।" খালেক সাহেব এবারে একটু যেন নরম হ'য়েই বললেন—"দেখুন, জানেনই তো, এখানকার কারো কারো প্রপার্টি—ইণ্ডিয়ার লোকের সংগে এক্সচেঞ্জ ক'রে একটা সেট্ল্‌মেণ্ট হয়েছে। কোন কোনটা আবার এনিমি প্রপার্টি হিসেবে গভর্ণমেণ্টে 'ভেষ্ট' করেছে।" বাধা দিয়ে প্রকাশ ব'লে ওঠে—"সম্পত্তির কোন ব্যাপারই আমাদের জিজ্ঞাস্য নয় স্যার। আমরা শুধু এবাড়ীর সাবেক বাসিন্দাদের ফ্যামিলির কোন খবর আপনার জানা থাকলে, সেইটুকু জানতে পারলেই

সন্তুষ্ট হই।” খালেক সাহেব বললেন—“আমি আগে ঢাকায় পোস্টেড ছিলাম। বছর দশেক আগে এখানে পোস্টিং পেয়ে—এখানকার কোর্টে জয়েন করেছি, আর এই বাসা—মানে, কোয়াটার্স—সরকার থেকে আমাকে য়্যালট্ করা হয়েছে। আমি এখানে আসবার কয়েক মাস পরেই অবশ্য জানতে পারি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বার্ডওয়ান ডিষ্ট্রিক্ট থেকে—কে এক মিঃ ভবতোষ ঘোষ এবাড়ীর দাবীদার হিসেবে আমাদের গভর্ণমেণ্টের সংগে লেখা-লেখি করেছিলেন। আর কিছু, বা তারপর কি হ'ল, তা আমার জানা নেই। তবে, তাঁর কয়েকটি চিঠি আমাকে দেখানো হয়েছিল—বাড়ীর 'ডিটেল' জানতে চেয়ে।” প্রকাশ উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে—“তাহলে দাবীদার ছিলেন একজন—নাম যাঁর ভবতোষ ঘোষ। কিন্তু স্যার বর্ধমান জেলা তো মস্ত বড়, ঠিক কোন জায়গা থেকে লেখালেখি চলছিল মনে পড়ে কি?” তৎক্ষণাৎ জবাব দেন খালেক সাহেব—“না, ব্রাদার।” পরক্ষণেই যেন কিছু মনে প'ড়ে যায়। জিজ্ঞেস করেন—“আচ্ছা, আপনাদের বার্ডওয়ান ডিষ্ট্রিক্টে 'খুলনা' ব'লে কোন জায়গা আছে? যেন মনে পড়ছে—জায়গাটার নাম ঐরকমই।” মিঃ ভাদুড়ী ব'লে ওঠেন—“না মশাই, ঐ নামে পশ্চিম বাংলায় কোন জায়গা আছে বলে মনে হয় না।” প্রকাশ চিন্তিত হ'য়ে পড়ে। আর বিশেষ কিছু জানা গেল না, উঠতে হল ওদের—খালেক সাহেবের কোর্টে বেরুতে দেরী হ'য়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।

ফেরার পথে, দু'শো গজের মধ্যেই একটি সাইনবোর্ডে প্রকাশের চোখ প'ড়ে যায়—“যশোহর বিদ্যা নিকেতন।” প্রকাশ ভাবল, দেবেশের বাবা কলকাতার কলেজে ভর্তি হবার আগে যদি এখানেই স্কুলে প'ড়ে থাকেন—বাড়ীর এত কাছের এই স্কুলটিতে পড়াই স্বাভাবিক। যদি অবিশ্যি অতদিন আগে স্কুলটির জন্ম হ'য়ে থাকে। উদ্দেশ্যের কথা কিছু না বলেই, মিঃ ভাদুড়ীর হাতে একটু টান দিয়ে প্রকাশ স্কুলটির দিকে পা বাড়াল। তখনো

স্কুল শুরু হবার সময় হয়নি। গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘরে একটি বৃদ্ধ লোককে পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বোঝা গেল, সে বর্তমান দারোয়ান ইয়াসিনের বাবা, নাম ইয়াকুব। ইয়াসিনের আগে সে-ই ছিল স্কুলের দারোয়ান। তখন অবিশ্যি স্কুলটির নাম ছিল — 'যশোধরা বিদ্যানিকেতন'—কোন মহীয়সী মহিলার নামে। প্রকাশ এইরকম পুরনো লোককেই খুঁজছিল। তার কাছে জানা গেল—স্কুলের বর্তমান কেরানীবাবুটি খুবই পুরনো লোক, তবে তিনি বেলা এগারটার আগে স্কুলে আসেন না।

ঠিক সওয়া এগারোটার সময় প্রকাশ মিঃ ভাদুড়ীকে সংগে নিয়ে স্কুলটিতে আবার প্রবেশ করল। অফিসঘরেই পাওয়া গেল কেরানীবাবুটিকে। টকটকে ফরসা — টুকটুকে পাকা আমটি যেন। প্রকাশের প্রস্তাব—চল্লিশ-বিয়াল্লিশ সালের স্কুলের রেকর্ড পাওয়া সম্ভব কিনা—শুনেই চোখ থেকে চশমাটি খুলে টেবিলের ওপর রেখে প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। সরাসরি জবাব দেন—"অত দিনের রেকর্ড পাওয়া অসম্ভব, অনেক ওলট-পালট হ'য়ে গেছে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে। স্কুলের নামই তো পালটে গেছে।" তিনি অবিশ্যি জানতে চান—অতদিন আগেকার খবরের কি প্রয়োজন ওদের। পাশের চেয়ারটিতে ভাদুড়ী সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে, সামনের চেয়ারটি টেনে ব'সে পড়ে প্রকাশ। মুখটা সামনে এগিয়ে দিয়ে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে প্রকাশ কেরানীবাবুটিকে বলে, "চল্লিশ-বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ ঐ ধরবাড়ীর একটি ছেলে এই স্কুলে পড়ত",—বলেই দূরের দেবেশদের পৈত্রিক বাড়ীটির দিকে আঙুল দেখায় প্রকাশ। ইতিমধ্যে ও ধরেই নিয়েছে ঐ বাড়ীটিই দেবেশদের। কেরানীবাবুটি অবশ্য বলেন—"ওটা তো 'চৌধুরী বাড়ী', আগে অবশ্য ওদের পদবী 'ধরচৌধুরী' ছিল। তবে 'চৌধুরী বাড়ী' বলেই পরিচিত। ঐ বাড়ীর অম্বিকাবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। 'মৌলবী' বলে ডাকতেন আমাকে। ওঁর

ছেলেটিকে আমি পড়িয়েছিলাম কিছুদিন।" প্রকাশ জিজ্ঞেস করে, "মৌলবী সাহেব, বলতে পারেন অম্বিকাবাবুর ঐ একটিমাত্রই সন্তান ছিল কিনা?" জবাবে মৌলবী সাহেব বলেন—"না-না, তা কেন, একটি ছোট্ট মেয়েও ছিল তাঁর। ছেলেটি যখন খুব নীচের ক্লাসে পড়ত—তখন যেমন তাকে পড়াতাম, তেমনি পরে মেয়েটিকেও পড়াতে শুরু ক'রেছিলাম। তখন তার বয়েস বড়জোর বছর চারেক। ছেলেটি বোধ হয় তখন কলকাতায় পড়তে চলে গেছে। তারপরই দেশে গোলমাল শুরু হ'ল। দেশভাগ হ'য়ে গেল—যত সব হুলুস্থুল কাণ্ড।" প্রকাশ জানতে চায়—"ছেলেটির নাম কি ছিল মনে করতে পারেন?" মৌলবীসাহেব বলেন—"নিশ্চয়, 'শক্তি' বলেই ডাকতাম আমি। ওটা ওর ডাক নাম। ভাল নামটা—এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।" বিব্রত বোধ করেন তিনি, মনে করার চেষ্টা করতে থাকেন। বলেন—"মনে পড়া উচিত ছিল আমার। স্কুলের সে একটি 'রত্ন' ছিল। মনে হয় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপও পেয়েছিল। নামটা মনে পড়া উচিত ছিল।" হঠাৎ উঠে গিয়ে কাঠের আলমারী খুলে একটা পাতলা মত ছাপানো বই বার ক'রে আনলেন। এক ঝলক তাকিয়েই বুঝে নেয় প্রকাশ—ওটি স্কুলের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উৎসবের 'স্যুভেনির'। মৌলবী সাহেব বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলতে থাকেন—"স্কুলের জীবনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে যে বছর যেসব ছাত্র বৃত্তি পেয়েছিল তাদের নাম এতে পাওয়া যাবে।" হঠাৎ একটি পাতায় থেমে গিয়ে পড়তে থাকেন তিনি—"এইতো ১৯৪৩ সালে বৃত্তি পেয়েছিল—অমিত শক্তি ধর চৌধুরী।" চশমাটি খুলে রেখে বলেন তিনি—"অমিত শক্তি আমাদের খুব স্নেহের পাত্র ছিল। খুবই 'প্রমিসিং' ছাত্র। 'শক্তি' বলেই ডাকত সকলে।" প্রকাশ জানতে চায়—অম্বিকাবাবুদের কোন খবর তিনি জানেন কিনা। জবাবে মৌলবী সাহেব হাতটা ওপর দিকে উঠিয়ে বলেন—

"সবই নসিব বাবা। শক্তি যখন কলকাতায় বি.এ. পড়ছে, মেয়েটি বছর পাঁচেকের—তখনই বাধল গোলমাল, ওঁরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। যেদিন চলে যান—সেদিন আমিও ওঁদের সংগে অনেকটা পথ গিয়েছিলাম। ওঁরা তখনও স্থির করতে পারেননি—কলকাতায় যাবেন, না নারায়ণগঞ্জে যাবেন।" মৌলবী সাহেবের কাছে আর কোন খবর পাওয়া গেল না। অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ে প্রকাশ। ওর প্রফুল্ল ভাব দেখে মিঃ ভাদুড়ী বিস্মিত হন। মুখে কিছু বলেন না।

কলকাতায় ফিরে আসবার দু'দিন পরেই প্রকাশকে দেখা করতে হ'ল মিঃ ভাদুড়ীর সংগে। সেই মতই কথা ছিল। তিনি তাঁদের বাংলাদেশ অভিযানের রিপোর্ট লিখে প্রকাশকে একবার দেখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। প্রকাশ প'ড়ে দেখল। তিনি লিখেছেন, তাঁদের বাংলাদেশ সফর সফল হয়নি, এবং মন্তব্য করেছেন, বিষয়টির আর তদন্ত চালানো উচিত নয়। প্রকাশ চাইছিল—লেখা হোক, ওদের সফর বিফল হয়নি, এবং এ ব্যাপারে আরো তদন্ত চালানো যেতে পারে। যাই হোক, পরের দিন বেলা এগারোটার সময় প্রকাশকে মিঃ ভাদুড়ীর সংগে লালবাজারে ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি কমিশনার, মিঃ ভার্গবের সংগে দেখা করতে হ'ল। মিঃ ভাদুড়ী তাঁর টাইপ করা রিপোর্টটি এগিয়ে ধ'রে বললেন—"অযথা আমার হয়রানি হ'ল স্যার। আগেই 'বলেছিলাম, এ কেস্ ক্লোজ ক'রে দেওয়া উচিত।" ডি.সি. অবাক চোখে তাকালেন।—"সেকি! আপনিই তো মিঃ সামন্তকে ধ'রেছিলেন—যাতে তিনি সুপারিশ করেন, বাংলাদেশে গিয়ে তদন্ত চালানোর জন্য।" তৎক্ষণাৎ জবাব দেন মিঃ ভাদুড়ী—"না, মানে, কি জানেন স্যার,—প্রকাশবাবু যেভাবে ধরলেন—আর উনি ছিলেন ঐ দেবেশ ছোকরার অভিন্নহৃদয় বন্ধু……।" আর বলতে হ'লনা, বিরক্ত ভাবে বললেন মিঃ ভার্গব—"সেন্টিমেণ্ট? দেখুন, আপনি পুলিশে চাকরী করেন……"

কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি। শুধু বললেন—"ঠিক আছে, রিপোর্টটা থাক, পরে দেখব। দরকার হ'লে পরে ডেকে পাঠাব আপনাকে।" অর্থাৎ আপনি এখন আসতে পারেন। মিঃ ভাদুড়ী উঠে পড়লেন, দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম বাজালেন। প্রকাশকেও উঠতে হ'ল। মিঃ ভার্গব বললেন—"আপনি বসুন, পরে যাবেন।" মিঃ ভাদুড়ী ভাবলেন—কিঞ্চিৎ ধমক-ধামক দেবার জন্যই আটকালেন তিনি প্রকাশকে।

মিঃ ভার্গব টেবিলের কাঁচের ওপর কাঁচের পেপার-ওয়েটটা উল্‌টে নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন—"চাকরী করবেন? ইনফরমারের চাকরী?" প্রকাশ অবাক। বলল—"না স্যার, আমার লেখাপড়া মাঝপথে এখনো, আর তাছাড়া ওই 'ইনফরমার' কথাটাই আমার য়্যালার্জি সৃষ্টি করে।" মিঃ ভার্গব বললেন—"ভেবে দেখে বলবেন, চাকরীটা নিলে আপনার নিজের কেসের তদন্তও চালাতে পারতেন সহজেই। আচ্ছা, এখন আমাকে উঠতে হবে, নমস্কার।" অর্থাৎ—'গেট আউট'।

থানা থেকে নাম ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে—গলি, তস্যগলি পার হ'য়ে, দেবেশদের বাড়ীর ঠিকে ঝি—কমলাদাসীর খোঁজ করতে করতে বেলা দশটা নাগাদ প্রকাশ ঠিকানাটা খুঁজে পেল। ছোট্ট একটা টিনের বাড়ী,—খান্ চার-পাঁচ ছোট ছোট ঘর। 'কমলাদাসী' এবাড়ীতে থাকে কিনা জানতে চাইলে একটি বার-তের বছর বয়েসের মেয়ে কেমন যেন বাঁকা চোখে তাকাল ওর দিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকতে আরম্ভ করল—"মাসী, ও মাসী, একটা লোক কম্‌লিদিকে ডাকছে দেখ।" মাঝবয়সী মোটাসোটা এক মহিলা বাইরে এলেন। জানতে চাইলেন, কমলাকে ওর কি দরকার? প্রকাশ ঠিক কী বলবে, কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে ব'লে ফেলল—"আমি থানা থেকে আসছি, ওর সংগে কথা আছে।" থানার নাম শুনে মহিলাটি একটু যেন সামলে নিয়ে বললেন—"সে তো এখন কাজে গেছে বাবু, ফিরতে সেই বিকেল পাঁচটা,

দু'বাড়ী কাজ করে তো। সকাল সাতটায় বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই বিকেলে।" অগত্যা প্রকাশকে বলতে হ'ল—"ঠিক আছে, আমি বিকেলেই আসব।" প্রকাশ ফিরে আসছিল, পিছন থেকে মহিলাটি ডাক দিলেন। ও মুখ ফেরাতেই বললেন—"ঠিক পাঁচটা নাগাদই আসবেন বাবু। কিছু মনে করবেন না—আজ শনিবার তো, কম্‌লির বাবুটি আজ আবার সাতটার মধ্যেই এসে যাবে। যা বদমেজাজী লোক—মেয়েটার উপরই না তম্বি করে।" কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকে—প্রকাশকে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে হয়। ফিরে আসে ও।

প্রকাশের বেশ মনে পড়ে — পরের দিন দুপুরে সোজা চলে আসে সে নেবুতলায়, বউবাজার হ'য়ে। সেখানে অল্প খোঁজ ক'রেই একটি ছোট্ট পার্কের ধারে মেস্‌টির সন্ধান পেয়ে যায় সে—যেখানে নাকি ধরবাবু এককালে বাস করেছিলেন—তাঁর চাকরীর প্রথম দিকে, অথবা সেই ছাত্র জীবন থেকেই।

সদর দরজার সামনেই একটি ভৃত্য-শ্রেণীর লোককে পেয়ে যায় প্রকাশ। জানতে চায়, বাবুরা কে কে আছেন এখন, দেখা করতে চায় ও। জবাবে লোকটি বলে—"এই নরহরি ছাড়া আর কাউকেই এই ভরদুপুরে পাবেন না তো। বাবুরা সব আসতে শুরু করবেন সেই সন্ধ্যে ছ'টার পর থেকে।" প্রকাশ বুঝতে পারে লোকটির নাম নরহরি। সম্ভবতঃ উৎকলবাসী, তবে চমৎকার বাংলা বলে। একটু এগিয়ে ও বলে—"তা,ভাই নরহরি, কাউকেই কি এখন পাওয়া যাবে না? একজন বোর্ডারও কি এখন নেই মেসে?" নরহরি বলে—"হাত-দেখা-বাবু আছেন কেবল, বিশ্রাম ক'রছেন।" প্রকাশ তাঁর সংগেই দেখা করতে চায়। "তিনি তিনতলার ছাদের ঘরে থাকেন, সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান—সামনেই তাঁর ঘর"—নরহরি বলে।

প্রকাশ সোজা উঠে যায় তিনতলায়। ঠিকই, সামনেই একখানি এবং একটিমাত্র ঘর। দরজাটা খোলা। দরজার. সামনে

এগিয়ে দেখে—ঘরের মেঝেয় দু'খানি প্রমাণ মাপের মাদুর পাশাপাশি পাতা। তার একটির ওপর—দেওয়ালে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আধ-শোয়া অবস্থায় ব'সে আছেন, চোখদুটি বন্ধ। সামনে নানা রংয়ের, নানা মাপের কাগজ পত্তর ছড়ানো। ঘরের বাঁপাশে একজন-শোবার মত একটি তক্তপোষে বিছানা পাতা। অন্য ধারে দেওয়াল ঘেঁষে তিনখানি কাঠের চেয়ার। ঘরের এককোণে একটি জনতা-স্টোভ্, কিছু কাপ-ডিস —চায়ের সরঞ্জাম।

গলার একটু শব্দ ক'রে প্রকাশ তার উপস্থিতি জানালো। ভদ্রলোক চোখ খুললেন। সাগ্রহে—"আসুন, আসুন, বসুন"—ব'লে মাদুরের দিকে দেখিয়ে দেন। ভদ্রলোককে ঠিক বৃদ্ধ বলা চলেনা। প্রৌঢ় বলাই ঠিক। ওর মনে হয়—আজকাল লোকে খুব একটা 'বুড়ো' হয় না। ঐ প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্তই। তারপর যেন থেমে যায়।

দরজার সামনে জুতো খুলে রেখে, ঘরে ঢুকে মাদুরে ব'সে পড়ে প্রকাশ। কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে ওঠেন—"কুম্ভরাশির জাতক, কর্কট লগ্নের, 'মাথা-কাটা'র, অর্থাৎ রাহুর দাস।" প্রকাশ কিছু না বুঝেই বলতে যায়—"আমি কিন্তু……।" ওকে কিছু বলতে না দিয়েই ভদ্রলোক বলেন—"কিচ্ছু বলতে হবে না। এ সময়টা সাধারণতঃ হতাশ প্রেমিক বা জোড় বাঁধার মতলব-ওয়ালা জোড়া জোড়া ছেলেমেয়েই আসে। তোমার তো দেখছি সেসব ব্যাপার নয় ভায়া। দেখি কোষ্ঠি খানা।" প্রকাশ আবার বলতে চেষ্টা করে—গণনার জন্যে সে আসেনি। তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ব'লে ওঠেন তিনি—"নেই কোষ্ঠি ? কিচ্ছু দরকার নেই, মুখমণ্ডলেই সব প্রকাশ। দেখি ডানহাতটি।" প্রকাশ যেন একটা নতুন রাস্তা দেখতে পায়। ডানহাতখানি বাড়িয়ে ধরে। জ্যোতিষী মশাই সেটি ভাল ক'রে দেখে নিয়ে, তার বাঁ হাতটিও চেয়ে নেন। এক ঝলক দেখে নিয়েই ছেড়ে দেন হাতখানি। বলেন—"চমৎকার,

ঠিক ঠিকই মিলে যাচ্ছে। জন্মে রাহু। তোমাকে সারা জীবন ছোটাবে, ছুটবেও তোমার পেছনে অনেক লোক। তারপর বলেন সুর ক'রে—"লগ্নে আছে মাথা কাটা, তার পেছনে ছোটে শতেক ব্যাটা। বর্তমানে 'রুক্ষ ঝামেলায়' ছুটোছুটি করতে হচ্ছে তো? তা হোক, সফলতা নির্ঘাৎ। এ থেকেই ভবিষ্যত।" প্রকাশ কৌতুক বোধ করে। একটু বাজিয়ে দেখবার জন্যেই বলে—"লেখা পড়া আর হবে কি দেখুন তো?" গণক ঠাকুর বলেন—"লেখাপড়া? লেখাপড়া এই তো শুরু হ'ল হে। এতদিন তো ছেলেখেলা করেছ।" কথাটা প্রকাশের পছন্দ হয় না। তাই সে তার নিজের ব্যাপারে চ'লে আসতে চায়, বলে—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বা এমন কি পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও—ধরবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক এই মেসে থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন কি আপনি?" গণক ঠাকুর মৃদু হেসে বলেন—"এটা তো ভায়া গণনা ক'রে বলা যাবে না, অন্ততঃ আমার ক্ষমতার বাইরে। আগে আমি একটি হোটেলে থাকতাম। এখানে এই নিরিবিলি ঘরটির সন্ধান পেয়ে বছর দশেক হ'ল এখানে বাসা বেঁধেছি। বর্তমানে অত পুরনো বোর্ডার নেই এই মেসে। তবে—নরহরি, মানে মেসের ঠাকুর, শুনেছি সেই বারো বছর বয়েস থেকে এখানে কাজ করছে। আগে ফাই-ফরমাস খাটত, পরে রান্নার কাজে লাগে। এখন ও-ই বলতে গেলে বোর্ডারদের অভিভাবক। ওর সংগে আলাপ ক'রে দেখতে পার।" প্রকাশ উঠতে চায়, বলে—"আপনাকে কি পরিমাণ প্রণামী দিতে হবে?" গণকঠাকুর বলেন—"রেট আমার পনেরো টাকা। তবে তুমি যখন গণনার জন্য আসনি, আর পকেটে তোমার অত টাকা নেই-ও, তাই পাঁচটি টাকা দিলেই হবে। নাও দিতে পার, তোমার মর্জি।" প্রকাশ অবাক হয়। একখানি পাঁচ-টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে ফেলে হাত তুলে নমস্কার করে। ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নীচে নেমেই নরহরিকে পাওয়া গেল। প্রকাশের জিজ্ঞাস্য

বিষয় শুনেই সে লাফিয়ে উঠল। "শক্তিবাবু!—তাঁকে কি ভোলা যায়? আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। আমরা দুজনে প্রায় একই সময়ে এই মেসে আসি কিনা। আমার বয়েস তখন বছর বারো। তিনিও ছেলেমানুষ ছিলেন, কলেজে পড়তেন। এখানে আসবার পর প্রথম প্রথম বাবা মায়ের জন্য 'মন কেমন' করত। মাঝে মাঝে কেঁদেই ফেলতেন। তখন আমারও মায়ের কথা মনে প'ড়ে যেতো। দুজনেই আড়ালে কাঁদতুম।" "তার পরের খবর তাঁর —কিছু জান কি?"—জিজ্ঞেস করে প্রকাশ। নরহরি বলে—"সে বিশেষ কিছু জানে না। কলেজে পড়া শেষ ক'রে তিনি চাকরীর চেষ্টা করতে থাকেন, দেশ থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়। কিছুদিন খবরের কাগজও বিক্রি করেছেন। কয়েকটা ছোটখাট চাকরীও করেন। পরে নাকি একটি ভালো চাকরী পেয়েছিলেন। তার বছর কয়েক বাদেই কোথায় যেন বাসা ভাড়া ক'রে চ'লে যান।" এর বেশী ওর জানা নেই। হঠাৎই যেন মনে প'ড়ে যায় নরহরির, ব'লে ওঠে—তাঁর কলেজের এক বন্ধু—হাবুলবাবু প্রায়ই আসতেন মেসে। উনি চাকুরী পাবার পরও আসতেন। আমাকে ওঁদের জন্যে চা, মুড়ি, তেলেভাজা এনে দিতে হ'ত প্রায়ই। তখন শুনেছিলুম, তিনি নাকি তাঁদের কলেজেরই মাষ্টার হ'য়ে গেছেন।" নরহরির কাছে এর বেশী কিছু জানা গেলনা। বিদায় নেবার সময় প্রকাশ নরহরিকে দু'টি টাকা দিতে চায়, সে কিন্তু তা নিতে রাজী হয় না কিছুতেই। শক্তিবাবুর কথা মনে পড়ায়—এতদিন পরেও ওর মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

বিকেল ছ'টায়, আবার যেতেই কমলার সংগে দেখা হ'ল। প্রকাশ বুঝতে পারল, কমলা তাকে প্রত্যাশা করেনি। অপেক্ষা করছিল পুলিশের আগমনের—শঙ্কিত চিত্তে। প্রকাশকে দেখে ও যেন আশ্বস্ত হল। সে ওকে অনেকবারই দেখেছে দেবেশদের বাড়ী, দুর্ঘটনার দিনতো বটেই। কমলা প্রকাশকে তার ঘরে এসে ব'সতে বলল। সসঙ্কোচে প্রকাশ তার ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকে—

একমাত্র বসবার জায়গা—তক্তপোষে পাতা বিছানায় বসল। ঘরটির মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ থাকলেও, পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো দেখে ও একটু অবাকই হ'ল। কমলা একটু দূরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। চোখে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

প্রকাশ কিভাবে শুরু করবে মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল—"তোমার মনিববাড়ীর সকলে একসঙ্গে মারা গেলেন, তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে কমলা?" কমলা কোন জবাব না দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল প্রকাশের মুখের দিকে। প্রকাশ আবার বলল—"তোমার মত আমারও খারাপ লাগছে। তুমি তো জান, দেবেশ আমার কত বন্ধু ছিল, আর বাড়ীর সকলেই আমাকে কত ভালোবাসতেন। আমি চাই—কিভাবে এবং কেন তাঁরা প্রাণ দিলেন, তা জানতে এবং বুঝতে পরিষ্কারভাবে। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না?" এতক্ষণে কমলা মুখ খুলল। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল—"আমি কি ক'রে জানব দাদাবাবু, আমি তো বিকেল চারটেয় কাজ ক'রতে গিয়ে ঐ অবস্থা দেখে আঁতকে উঠি। বাইরে এসে লোকজন ডাকতে যাচ্ছি—আপনি পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।" প্রকাশ তাকে ভরসা দিয়ে বলে—"দেখ কমলা, তুমি আর আমি দুজনেই এ ব্যাপারে কিছু জানিনা। কিন্তু ওদের বাড়ীর ভেতরের খবর আমি যতটা জানি তার থেকে তোমার বেশী জানবার কথা।" কমলা যেন আবার ভয় পেয়ে গেল, বলল—পুলিশের ব্যাপারে তার খুব ভয় ধ'রে গেছে। তবু প্রকাশ যদি কিছু জানতে চায়, ওর জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলবে। তবে, পুলিশ যেন তাকে নিয়ে টানাটানি না করে।

প্রকাশ তার কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগটা থেকে সেই পুরনো ফটোটা বার ক'রে কমলাকে দেখিয়ে বলে—"দেখতো এই ছবিটা এর আগে কখনো দেখেছ কিনা?" ছবিটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে ছাখে কমলা। তারপর বলে—"ঠিক এটা

কিনা জানিনা—তবে, এইরকম একটা ফটো নিয়ে ব'সে—বাড়ীর সকলে কি সব বলাবলি করছিল, মারা যাবার দিন দুয়েক আগে বিকেল বেলা। আমি চায়ের খালি কাপগুলো ঘর থেকে আনতে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই সকলে চুপ ক'রে গেল। কি কথা হচ্ছিল আমি কিছু শুনিনি।" প্রকাশ বলল, "এই ফটোটা সামনের দেরাজের ওপরের তাকেই ছিল। তাই মনে হ'চ্ছে এটা ওঁরা অল্প কিছু আগে নিশ্চয়ই দেখেছেন। এত পুরনো ফটো—অথচ সামনেই রয়েছে তাই আমার একথা মনে হচ্ছে। আর, তুমিও তো বলছো, ওঁরা সকলে মিলে এটা সামনে রেখে কি যেন আলোচনা করছিলেন। ঠিক কিনা ?" কমলা সমর্থনের ঘাড় নাড়ল। প্রকাশ আবার জেরা শুরু করে—নরম স্বরে। বলল—"আচ্ছা কমলা, শুনেছি মারা যাবার কয়েকদিন আগে মেসোমশাই—মানে দেবেশের বাবা—দিনকয়েকের জন্যে একবার বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, আর তার দু'একদিন পরেই আবার কালনা গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন, কোথায় বা কার কাছে গিয়েছিলেন, যাবার আগে বা পরে তিনি কিছু বলেছিলেন কি না জান কি ?" কমলার হঠাৎই মনে প'ড়ে যায়। বলে—বেশ ক'দিন আগে সকালে যখন ও ওপরের ঘরটা পরিষ্কার করতে যায়, তখন বড়বাবু ঐ দেরাজের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন একখানা কাগজ দেখছিলেন মন দিয়ে। কমলা ঘরে ঢুকতেও তাঁর খেয়াল হয়নি। সে ঝাড়ু দিতে দিতে তাঁর কাছাকাছি হ'তেই যেন চমকে উঠে কাগজটা দেরাজের মধ্যে রাখলেন। এখন মনে হচ্ছে, সেই কাগজটা বোধহয় ঐ ফটোটাই হবে। তার দু'একদিন পরে তিনি বাংলাদেশে চলে যান। কেন গেলেন—তা বোধহয় কাউকে ব'লে যাননি। প্রকাশের প্রশ্নের জবাবে কমলা বলে—"মা বলছিলেন কিনা দাদাবাবুকে—বাবুর মাঝে মাঝে কি যেন হয়, বলা নেই, কওয়া নেই, হুট হাট ক'রে কোথায় চলে যান। বাংলাদেশে যাবার কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোথায় বা

কেন, তা বোধ হয় ব'লে যাননি। তারপর যখন ফিরলেন—খুব গম্ভীর লাগছিল তাঁকে। বাড়ীর কেউ তো কথাই বলতে পারছিলেন না তাঁর সংগে। তারপরই তো কালনা চ'লে গেলেন।" কমলার কাছে আর কোন সংবাদ পাওয়া যাবে না বুঝে প্রকাশ উঠে পড়ে। বলে, "আজ চলি, দরকার হলে আবার আসব।" কমলা ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। প্রকাশ রাস্তায় নেমে আসে।

পরের দিন রবিবার। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, চা খেতে খেতে—এ পর্যন্ত পাওয়া সূত্রগুলো মনে মনে সাজাতে থাকে প্রকাশ। কেবলই একটা কথা ঘুরে ফিরে মনে আসছিল ওর—কালনায় গেলে হয়তো কোন সূত্র মিলতে পারে। বিপিনবাবুর কাছে শোনা মনোতোষ না মনোমোহন ঘোষ—দেবেশের বাবার শ্বশুরমশাই তো কালনারই লোক। হঠাৎ—বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা ওর মনের মধ্যে খেলে যায়। যশোরের আবদুল খালেকের ভাষায়—বার্ড্‌ওয়ান ডিস্ট্রিক্টের 'খুলনাই' তো আসলে কালনা হ'তে পারে। আর এ-কথাও তো ব'লেছিলেন—সেখানকার কে এক ভবতোষ ঘোষ নাকি ছিল দাবিদার—চৌধুরী বাবুদের বিষয় সম্পত্তির। এই ভবতোষ ঘোষই মনোতোষ বা মনোমোহন ঘোষের কেউ হয়না তো ? ভাই কিংবা ছেলে ? সেই সুবাদেই দাবিদার হ'তে চেয়েছিল। ওর মনে পড়ে যায়, বিপিনবাবুর কথা—ধরবাবুর শ্বশুরবাড়ী কালনার শ্মশানঘাটের সন্নিকটে। সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ায় প্রকাশ। মা ব'লে ওঠেন—"কি হ'লরে ? চা যে প'ড়ে রইল ?" ইদানীং ছেলের প্রতিটি নড়াচড়ার প্রতিই প্রখর দৃষ্টি রাখছেন তিনি শঙ্কিত মনে।

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে প্রকাশ। সোজা হাওড়া স্টেশনে। তখন কালনা যাবার কোন ট্রেন নেই। হতাশ হয় ও। জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানতে পারে, ঘণ্টাখানেক পরে ব্যাণ্ডেল থেকে কালনা লাইনের একটি ট্রেন ছাড়ার কথা। এখনই

ব্যাণ্ডেল লোকাল পাওয়া যাবে। তাতে চলে গেলে ব্যাণ্ডেলে ট্রেনটি ধরা সম্ভব হ'তে পারে। তাই করল প্রকাশ।

কালনা স্টেশনের বাইরে আসতেই একটি রিক্সাওয়ালা এগিয়ে এসে ওকে নিয়ে যেতে চাইল। ও বলল—শ্মশানঘাটে যাবে—কত ভাড়া নেবে সে? রিক্সাওয়ালা দেড় টাকা দাবী করল। প্রকাশ রসিকতা করল—"পৌঁছতেই দেড় টাকা? বাকীটার জন্যে কত পড়বে ভাই?" রিক্সাওয়ালা ঠিক বুঝল না। জানতে চাইল—তার কোন লোককে সেখানে দাহ করা হচ্ছে কিনা? প্রকাশ বলল—দাহ বহু দিন আগে হয়ে গেছে, এখন ও শুধু ছাই ঘাঁটতে যাচ্ছে। রিক্সাচালকটি দেখা গেল বড় বেশী বক্‌বক্ করে। সংক্ষেপে সে কালনার সব দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা দিতে দিতে রিক্সা চালাতে লাগল। গল্প করতে করতে ওরা শ্মশানঘাটের কাছে পৌঁছে গেল। প্রকাশ রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে, চারিপাশে তাকিয়ে জায়গাটা ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

কাছাকাছি কোন ঘরবাড়ী দেখতে না পেয়ে প্রকাশ একটু হতাশই হয়। কাটারী হাতে গ্রামের একটি চাষী-শ্রেণীর লোককে যেতে দেখে ও ভবতোষ ঘোষের হদিশ জানতে চাইল। লোকটি ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ডানদিকে আঙুল দেখিয়ে বাঁশের বেড়া-ঘেরা টিনের চালের বড়সড় একটি বাড়ীর দিকে দেখিয়ে, সেখানে খোঁজ করতে বলল। তার নির্দেশমত গিয়ে বাড়ীটার মস্ত বড় টিনের ফটকটার সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে ভরাট গলার আহ্বান এল—"ভেতরে আসুন। কি চাই বলুন?" প্রকাশ দু'পা এগিয়ে যেতেই বছর পঞ্চাশ বয়েসের একটি লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। লোকটির গায়ের রং বেশ কালো, বেঁটেখাট, বেশ মজবুত চেহারা, প্রায় বামন গোছের। মাথায় কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল। সে প্রকাশের দিকে একটা 'কোরা' চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বলল। চেয়ারটি তখনও ঘষামাজা এবং পালিশ করা বাকী।

লোকটি—প্রকাশের মনে হল—ওকে খরিদ্দার ভেবেছে। প্রকাশকে তাই বলতেই হয়—ও খরিদ্দার নয়, কলকাতা থেকে এসেছে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে—এখানকার শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘোষ মহাশয়ের কাছে। লোকটির আচরণ সংগে সংগে পাল্টে গেল। একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই বলল—"আমারই নাম ভবতোষ ঘোষ। কিন্তু সংবাদ-টংবাদ সাপ্লাই করা আমার ব্যবসা নয়।"

প্রকাশ তাকে বোঝাতে গেল—কয়েকটা জরুরী খবর তার জানার আছে, এবং তিনি যদি সাহায্য করেন একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হবে। লোকটি কিন্তু আর তাকে পাত্তাই দিতে চাইল না। বরং একটু দুর্ব্যবহারই করল। হাত জোড় ক'রে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল—"আমি কাজের মানুষ মশাই, বাজে কাজে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। আপনি আসতে পারেন।" অগত্যা প্রকাশকে বলতেই হ'ল—"আচ্ছা, আপনি অন্ততঃ এখানে ব্রজেনবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর ঠিকানাটা আমাকে বলুন।" লোকটি খেঁকিয়ে ওঠে। "কে ব্রজেনবাবু? আমি কাউকে চিনিনা মশাই।" প্রকাশ শেষ চেষ্টা করে—"ব্রজেন নামে একটি লোক—কলকাতার এক অফিসে পিয়নের কাজ করত, এখন রিটায়ার করেছে, এই কালনারই লোক, আপনাদের ভালোভাবেই চেনে।" ওকে তাড়াবার জন্যেই বোধ হয় ভবতোষ একটু ভদ্রতাই করে। বলে—"সামনের ওই তে'মাথার মোড়ে বাঁদিকের দো'তলা বাড়ীটার পেছনের বাড়ীতে ব্রজেন খুড়ো থাকে। হাঁপানী রুগী। চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন, আমাকে রেহাই দিন।" বলেই ভবতোষ পিছন ফেরে। অগত্যা প্রকাশকে ব্রজেনের সন্ধানে যেতে হ'ল। অল্প চেষ্টাতেই ব্রজেনকে পাওয়া গেল। সত্যিই হাঁপানী রুগী। হাঁপের দমকে কথাই বলতে পারছে না।

ব্রজেনের কাছে জানা গেল, ধরবাবুদের সপরিবারে আত্মহত্যার খবর সে কাগজে পড়েছে। কিন্তু শরীরের এমনই অবস্থা যে

কলকাতায় গিয়ে খবরাখবর করার ক্ষমতা নেই। গিয়েই বা কী ফল হত—সকলেই যখন মারা গেছেন। প্রকাশ ব্রজেনকে জানাল ভবতোষের সংগে তার আলোচনার বিবরণ। শুনেই ব্রজেন বলল—"ও একটা বাস্তু ঘুঘু, স্বার্থ ছাড়া ও মুখ খুলবে না।" শুনে প্রকাশ কিছুটা ভরসা পায়। বলে—"নিজের বোন, ভগ্নীপতি, ভাগ্নে, ভাগ্নী মারা গেলেন, অথচ সেকথা বলবার সুযোগই পেলাম না। এমন একটা দুঃসংবাদ তো দুম ক'রে ব'লে ফেলা যায় না।" ব্রজেন বলে—"তাতে ওর কোন বিকারই প্রকাশ পেত না, যা পাষণ্ড লোক। আর তাছাড়া, আপন বোন তো নয় ; দূরসম্পর্কের পালিত বোনই বলতে পারেন। ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচেছে ওরা। বাপটাও যেমন ছিল একটা ক্ষুদে শয়তান আর পাঁড় মাতাল, ছেলেটিও তেমনি ঠিক শয়তানের বাচ্চাই।" প্রকাশ উঠে পড়ে। ফের ভবতোষের সংগে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয় সে।

ধীরপদে পা চালায় প্রকাশ ভবতোষের আস্তানার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ ওর মনে হয়—একটা অর্থপ্রাপ্তির টোপ না ফেললে মুখ খুলবে না পাষণ্ডটা। মতলবটা মাথায় ভেঁজে নেয়।

ফের ওকে আসতে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে ভবতোষ। সে কিছু বলবার আগেই প্রকাশ বলে—একটা মস্ত অংকের অর্থ-প্রাপ্তির সুযোগ হ'য়েছে বোধহয় ভবতোষের, যেটা ঠিক যাচাই না ক'রে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। অংকটি কত, জানতে চায় ভবতোষ। প্রকাশ প্রকাশ করে—তা লাখ-দেড়েক হ'লেও হ'তে পারে। তৎক্ষণাৎ 'জল' হয়ে যায় ভবতোষ। চেয়ারটা আবার এগিয়ে দেয় ওর কাছে। কোন ভনিতা না ক'রেই প্রকাশ তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সেই সাবেক ফটোটি বার ক'রে দেখায় ভবতোষকে। বলে—"দেখুন তো, এদের চিনতে পারেন কি না ?" ফটোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভবতোষ। কী যেন চিন্তা করে কিছুক্ষণ। তারপরই ছুট দেয় পেছন দিকে, অর্থাৎ তার বাসার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ একা ব'সে থাকতে

হয় প্রকাশকে। মিনিট পনেরো পরে প্রফুল্ল মুখে ফিরে আসে ভবতোষ, হাতে তার পুরনো খবরের কাগজে মোড়া একটা বড়-সড় পাতলা বস্তু। কাছে এসেই সেটা খুলে একটা অতি পুরনো ফটো বার ক'রে দেখায়। দেখতে ঠিক প্রকাশের কাছে রাখা ফটোটির মত; মানুষজন তাতে অবশ্য অন্য। ভবতোষ বলে—"আমি তখন খুব ছোট। বাবা আমাদের নিয়ে যখন নারায়ণগঞ্জ থেকে এখানে আসেন, তখন আমাদের সংগে আমাদের যশোরের মামা, মামী আর তাদের একটি ছোট্ট মেয়েও সংগে আসে। এখানের শ্মশানে ফটো তোলার জন্যে একজন ক্যামেরাধারী লোক এসেছিল। তার কাজের দেরী হচ্ছিল ব'লে কিছুক্ষণ আমাদের এখানে বসতে চেয়েছিল। বাবা তাকে দিয়ে আমাদের ছবি তোলান—মামার তাগিদে। মামা মামীদের একটা ছবি—সেটা মনে হচ্ছে আপনার হাতে রয়েছে; আর আমার হাতেরটি আমাদের ফ্যামিলির ছবি। এই দেখুন, এতে আমার বাবা, মা, আর আমার ছবি।" প্রকাশ জানতে চায়—"আর আমারটায় কার কার ছবি?" ভবতোষ আবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে, দেখায়—"এটা আমার মামার ছবি, এটা মামীর, এটা ওদের মেয়ে অপর্ণার, আর এই ছেলেটি—এটা আমি। মিলিয়ে দেখুন আমার ছবি এটাতেও আছে—" বলে তার হাতের ফটোটা দেখায়। প্রকাশ ছ্যাখে—সত্যিই দু'টি ছবি ভবতোষেরই—এক চেহারা, এক পোষাক। প্রকাশ জানতে চায়—তার এই মামা, মামী এবং তাঁদের মেয়ের নাম কি? তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় ভবতোষ—"মামার নাম অম্বিকা চৌধুরী। মামীর নাম শুনিনি, মনে পড়ছে না। মেয়েটির নাম তো অপর্ণা।" ভবতোষের মুখে এখন খই ফুটছে। নিজে থেকেই ব'লে চলে—"মামা যশোর থেকে আমাদের বাড়ী নারায়ণগঞ্জে যাবার সময় অনেক জিনিষ পত্তর, টাকা কড়ি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে পালাবার তাগিদে অবিশ্যি জিনিসপত্তর বিশেষ কিছুই এখানে আনা যায় নি। আমি

তখন খুবই ছোট। বাবার কাছে সেই পালাবার সময়ের বিপদের অনেক গল্প শুনেছি। টাকাকড়ি মামার যা ছিল—তার অনেকটাই ওখানে খরচ হয়ে যায়। এখানে এসে মামাই এই জমিটুকু কিনে বাবাকে কাঠের গোলা করতে বলেন। প্রথমে শুধু শ্মশানের কাঠই সাপ্লাই হ'ত। পরে আমি এটাতে কাঠের কাজের ব্যবস্থা করি মামা মামী মারা যাবার পর।" প্রকাশ জানতে চায়—মামা মামী কিভাবে মারা গেলেন? "কলেরা", সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় ভবতোষ—"একদিন আগে পিছে দু'জনে মারা গেলেন। বাবা ডাক্তার ডাকারও সময় পায়নি। মেয়েটা প্রায় আমারই বয়সী—দু'এক বছরের ছোট হবে বড় জোর। পরে বাবাই তার বিয়ে দেয় —কলকাতার এক বাবুর সংগে, ঐ ব্রজেন খুড়োই ঘটকালী করে।"

প্রকাশ জানতে চায়—"তা আপনার কলকাতার জামাইবাবুটির নাম কী মনে পড়ে?" অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে ভবতোষ। তারপর মনস্থির ক'রেই যেন বলে—"মনে ছিল না। কয়েকদিন আগে তিনি এখানে এসে খোঁজ খবর ক'রে আমার সংগে দেখা করেন। নাম অমিতশক্তি ধর। তিনি আমার মামা মামী আর তাদের মেয়ের ছোট বেলাকার খবর সব জানতে চান। মামার নাম শুনেই এবং তাঁরা যশোরের লোক শুনেই কেমন যেন হ'য়ে যান। এতক্ষণ বলিনি—আপনার হাতের এই ছবিটি তিনিও সংগে এনেছিলেন এবং এতে মামা, মামী এবং মেয়ে অপর্ণার ছবি চিনে নিতে বলেছিলেন। তারপর কি হ'ল কে জানে, এক গ্লাস জল পর্যন্ত না খেয়ে বিদায় নিলেন তিনি। আর আসেননি।"

প্রকাশ ভবতোষকে ধরবাবুর অফিসের ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বলে—'আপনার বোন ভগ্নীপতি, তাঁদের ছেলেমেয়ে সব এক সংগে মারা গেছেন। এই ঠিকানায় গিয়ে যোগাযোগ করলে আপনি মামার অফিস থেকে পাওনা সব টাকা পেতে পারেন। ওঁদের আর কোন ওয়ারিশ নেই।" এক মুহূর্ত

অপেক্ষা না ক'রে বিদায় নেয় প্রকাশ। ভবতোষ প্রায় ছুটে এসেই তাকে থামাতে চেষ্টা করে। প্রকাশ যেন পালিয়েই আসে।

ভাবতে বসে প্রকাশ—মাথায় এক রাজ্যের জট পাকানো সূত্র নিয়ে। সন্তর্পণে এক একটি জট যতই ছাড়াতে থাকে, অপর একটি জটের যেন সৃষ্টি হ'য়ে যায়। ধীরে সংযত চিত্তে চিন্তা ক'রে চলে প্রকাশ। ধীরে ধীরে যেন আলো দেখতে পায় সে।

যশোরে অশ্বিনী কুমার ধর চৌধুরীর ছেলে হলেন—অম্বিকা চরণ চৌধুরী। তাঁর একমাত্র ছেলে শক্তি, আর একটি শিশুকন্যা—যার নাম জানা যায় নি। এই অম্বিকা চৌধুরীর ছেলে শক্তি—অমিতশক্তি চৌধুরী কলকাতায় পড়তে আসে ১৯৪৪/৪৫ সালে। —এদিকে যে 'শক্তি' কলকাতার নেবুতলার মেসে থেকে কলেজে পড়াশোনা ক'রেছে, পরে চাকুরী জুটিয়েছে, এবং বাসস্থান পরিবর্তন ক'রেছে—তিনিই যদি হন আলোচ্য 'ধরবাবু' অর্থাৎ দেবেশের বাবা, তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? পুলিশ রেকর্ড এবং সংবাদপত্রের খবরে পাওয়া গিয়েছিল—সমবেত আত্মহত্যার প্রধান ব্যক্তির নাম—অমিত ধর। দেবেশের বাবার অফিসের রেকর্ড এবং হাজিরা খাতায় তাঁর নাম পাওয়া গিয়েছিল—Mr. A. S. Dhar। দেবেশের বাবার ছদ্মনামে লেখা বই-গুলির প্রকাশকের কাছেও তাঁর ঐ "এ. এস. ধর" নামটি পাওয়া গিয়েছিল। নেবুতলার মেসের 'শক্তি'র সহপাঠী, বর্তমানের প্রফেসর দাসের কাছে জানা গেছে—'শক্তি'র ভালো নাম ছিল 'অমিট্' এবং ঐ নামেই ক্লাসের সবাই তাকে ডাকতো। পদবীটা অবশ্য 'ধর'-ই।

প্রকাশ ভেবে চলে। তাহলে কি যশোরের অম্বিকা চৌধুরীর ছেলে 'শক্তি'—কলকাতায় এসে তাঁর পদবীটা পাল্টে চৌধুরীর বদলে 'ধর' ক'রে নেন? অস্বাভাবিক নয়। কারণ তাঁর পিতামহ ছিলেন 'ধরচৌধুরী'। বাবা যদি ধরচৌধুরীকে 'চৌধুরী' বানাতে পারেন, ছেলে তাকে 'ধর' বানাবে এতে অবাক হবার কি আছে?

আর, 'অমিতশক্তি ধরচৌধুরী'-র থেকে 'অমিতশক্তি ধর' নামটি বেশী লাগসই। 'অমিতশক্তিধর'। তাহলে এদিকটা দেখা যাচ্ছে বেশ পরিষ্কার। কিন্তু সমবেতভাবে আত্মহত্যার কারণটা ?

প্রকাশ ভাবতে থাকে। ধরবাবু বিয়ে ক'রেছিলেন কালনায় মনতোষ ঘোষের পালিতা কন্যা অপর্ণাকে। ভবতোষ ঘোষের কাছে জানা গেছে অপর্ণা তার সহোদর বোন নয় ঠিকই, তবে অনাত্মীয়ও নয়। তাহলে সম্পর্কটা কেমন। এখানেই জটিলতা। মাথার মধ্যে ঝিলিক দেয় প্রকাশের! আরে এ তো জলের মতই সোজা ব্যাপার। যশোরের অম্বিকা চৌধুরীর ছেলে যেমন এখানকার অমিতশক্তি ধর—তেমনি কালনায় ভবতোষের মামাতো বোন অপর্ণা চৌধুরীও তাঁর মেয়ে। না জেনে অমিতশক্তি নিজের সহোদরাকেই বিয়ে ক'রে ফেলেছিলেন এবং পদবীটা তাঁর 'ধর' হওয়াতে—ভবতোষের বাবাও ভাবতে পারেননি যে অপর্ণা চৌধুরী অমিতশক্তি ধরের সহোদরা।

এতই স্পর্শকাতর ছিলেন দেবেশের বাবা, মা, দেবেশ এবং বোন—যে এই 'সহোদরা'কে বিবাহ এবং পুত্র কন্যার জন্ম—তাঁরা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু আত্মহত্যা—সমবেতভাবে আত্মহনন ছাড়া—অন্য কোন পথ কি তাঁরা খুঁজে পেতে পারতেন না ? এ প্রশ্নের জবাব আজ কে দেবে ? তাঁদের পরিবারের সকলের উচ্চমানের মানসিকতা, তাঁদের আদর্শবোধ, তাঁদের রুচি, সংস্কৃতি—সবই তো প্রকাশের দীর্ঘ দিন থেকেই জানা। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা যে সকলে পরামর্শ ক'রেই—সবকটি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—একথা যতই বেদনার হোক—এ সিদ্ধান্ত যে তাঁদের কাছে অনড়, অপ্রতিরোধ্য—তা আর যেই হোক, প্রকাশ বিশ্বাস না ক'রে পারে না।